আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন দিক লইয়া সাময়িক পত্রে কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেইগুলি একত্রিত করিয়া বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আমি কোনও বিশেষজ্ঞ নই, এ-বিষয়ে আমার অধ্যয়ন কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে বাংলায় বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্যের আলোচনা বড় কম, তাই যেটুকু জানিয়াছি তাহাই সাধারণ পাঠকের নিকট নিরভিমানে তুলিয়া ধরিতে উৎসাহী হইয়াছি। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যবৃদ্ধির কাজে লাগিবে না এই গ্রন্থ; যাঁহারা অল্পতেই খুসি হইবেন তাঁহাদের জন্যই ইহা প্রকাশিত। এই প্রবন্ধগুলি রচনায় কলিকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের শ্রদ্ধেয় ধর্মপাল ভিক্ষু ও জ্ঞানানন্দ ভিক্ষু মহাশয়গণের নিকট হইতে যে প্রেরণা লাভ করিয়াছি তাহা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

প্রাচীন বাংলায় লিখিত বৌদ্ধ চর্যাগীতি ও দোহাকোষের ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি এবং এই গান ও দোহাগুলিতে বর্ণিত তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধেও কয়েকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গান ও দোহাগুলি সম্বন্ধে এখন নানা কারণে আমাদের ঔৎসুক্য দেখা দিয়াছে, সেই ঔৎসুক্যের কথা স্মরণ করিয়া সেই প্রবন্ধগুলিও এই সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করিলাম। ঔৎসুক্যের চরিতার্থতার জন্য আমার এই গ্রন্থ নয়—আমার গ্রন্থ ঔৎসুক্য বৃদ্ধির জন্য। এই গ্রন্থ যদি বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্যের সম্বন্ধে পাঠক সমাজের বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য বাড়াইয়া তোলে তবেই আমি আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থরচনার প্রয়াস সার্থক মনে করিব।

৫১।৩৪বি চারু এভেনিউ, কলিকাতা-৩৩
বুদ্ধ-পূর্ণিমা, ১৩৬৪

বিনীত
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

বৌদ্ধ অনাত্মবাদ

হিন্দু ধর্ম এবং দর্শনের চিন্তাধারার সহিত সুপরিচিত মনের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শনের ভিতরকার যে সব চিন্তা খুব সহজগ্রাহ্য নয়, তাহাদের ভিতরে প্রধান হইল বৌদ্ধ অনাত্মবাদ। আত্মবাদ ভারতীয় হিন্দুমনের একটি দৃঢ়মূল সংস্কার, সেখানে নাড়া পড়িলে আমাদের মনের ভিত্তিতেই যেন একটা নাড়াবোধ করি, এবং তাহারই পরিণাম একটি অস্বস্তিকর মানসিক দ্বন্দ্ব।

বৌদ্ধ অনাত্মবাদ কি জিনিস তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে হিন্দু আত্মবাদ কি জিনিস তাহা ভাল করিয়া বিশ্লেষ করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় এই হিন্দু আত্মবাদ এবং বৌদ্ধ অনাত্মবাদের বিশ্লেষণে দার্শনিক সূক্ষ্মতর্ক যথাসম্ভব বাদ দিয়া আমাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুধর্মের আত্মবাদের ভিতরে আমরা আত্মার দুইটি রূপ দেখিতে পাইতেছি, আত্মা যেখানে এক, সর্বব্যাপী, অভিন্ন এবং সর্বপ্রকার উপাধি-বিনির্মুক্ত সেখানে আমরা তাহাকে গ্রহণ করি পরমাত্মা বলিয়া, আর প্রত্যেক জীবের ভিতরে তাহার পৃথক্ পৃথক্ গুণকর্মাদি দ্বারা উপাধিগ্রস্ত বা সীমাবদ্ধ যে আত্মা তাহাই জীবাত্মা। আমাদের মনের মধ্যে যে জীবাত্মার ধারণাটি রহিয়াছে তাহাকে আমরা বিশ্লেষণ করিলে আবার দুইটি জিনিস দেখিতে পাই, একটি হইল আত্মা, অপরটি হইল জীব,—যদিও আমাদের মনের মধ্যে এই দুইটিই অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিয়া থাকে। জীবকে আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বলিতে পারি আমাদের ব্যক্তিসত্তা, এই ব্যক্তিসত্তার আমরা স্বভাবতই একটি শাশ্বত অধিষ্ঠান বা আশ্রয় খুঁজি—সেই শাশ্বত অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ই হইল আত্মা। আমাদের ভিতরে যে একটি ব্যক্তিসত্তার বোধ দেখিতে পাই তাহা আমাদের ভিতরে কি করিয়া গড়িয়া ওঠে? সর্বপ্রকার ধর্মসংস্কার বাদ দিয়া যদি বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে জিনিসটি বিচার করি তবে দেখিতে পাই, আমাদের সর্ববিধ কর্ম-প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া আমাদের একটি চেতনার ধারা গড়িয়া উঠিতেছে এবং এই চেতনার ধারা আমাদের কর্মপ্রবাহের সঙ্গে

সঙ্গে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহেরও লাভ করিতেছে। আমাদের চৈতন্যের ভিতরে এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহত্ব দান করিতেছে যে শক্তিটি তাহাকে আমরা সাধারণ নাম দিতে পারি স্মৃতি। এই স্মৃতিশক্তি একটি অপূর্ব রহস্যময়ী শক্তি—আমাদের স্পষ্ট চেতনলোকের ভিতরে আমরা যেমন তাহার দেখা পাই—আমাদের অবচেতন, অচেতন লোকের ভিতরেও তাহার গভীরতর কাজ চলিতেছে। আসলে এই স্মৃতিশক্তি হইল একটি ধারক শক্তি—যাহা আমাদের চেতনার কোনও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই একেবারে হারাইয়া যাইতে দেয় না, তাহাদিগকে বিধৃত করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। এই যোগের ফলেই আমাদের চেতনার সকল মুহূর্তের সকলটি অংশ একত্রিত হইয়া একটি অখণ্ড প্রবাহের সৃষ্টি করে। আবার আরও লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের চেতন-প্রবাহের মধ্যে শুধু যে একটা অনবচ্ছিন্নতা বা অখণ্ডতাই (continuity) রহিয়াছে তাহা নহে, তার সঙ্গে আবার আছে একটি ঐক্যের প্রত্যয় (sense of identity)। অর্থাৎ যে আমি একদিন ক্ষুদ্র শিশুরূপে উত্তানশয়ান হইয়া হাতপা ছুঁড়িয়া খেলা করিয়াছি,—সেই আমিই যৌবনে সকল রঙিন স্বপ্নের পিছনে ছুটিয়াছি,—আবার প্রৌঢ়বয়সে কর্ম ও চিন্তায় প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিয়াছি। স্মৃতিশক্তিরূপে আমাদের ভিতরে যে ধারকশক্তিটি রহিয়াছে সে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবনের সকল যুগের সকল প্রকার চেতনার ভিতরে একটা ঐক্যদান করিয়াছে—সেই ঐক্যের বোধ আমার বর্তমান স্পষ্ট চেতনলোকের মধ্যে হয়ত অল্প—আমার অবচেতন এবং অচেতনের ভিতরেই অধিক।

চেতনার এই অনবচ্ছিন্নতা-বোধের সহিত আমাদের যুক্ত হইয়া থাকে আর একটি বোধ—তাহা হইল এই, আমরা বুঝিতে পারি যে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্বের ভিতর দিয়া অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে যে চেতন-প্রবাহ তাহার ভিতরে কোথাও কোনও অংশের সহিত অপর কোন অংশের কোনও মৌলিক পার্থক্য নাই—মূলতঃ সে একই। এই একত্বের বোধ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই একের আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপে দেখা দেয় একটি ব্যক্তিত্ব-বোধ। অর্থাৎ আমরা মনে করি, একটি বিশেষ জীবন-প্রবাহের ভিতর দিয়া একটি বিশেষ সত্তাই নিজেকে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া নানাভাবে ব্যক্ত করিতেছে। সমগ্র জীবন-প্রবাহের ভিতর দিয়া 'ব্যক্তি' বা প্রকাশ লাভ করিতেছে যে সত্তা তাহাই হইল আমার ব্যক্তি-সত্তা। এই ব্যক্তি-সত্তাই হইল জীব।

এখন প্রশ্ন হয় এই যে, একটি বিশেষ জীবনের মধ্যে যে একটি বিশেষ ব্যক্তিপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম তাহা কি কালের স্রোতের মধ্যে একটি ভাসমান সত্তা মাত্র ? এক জীবনের শেষ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাহার শেষ হইয়া যায়,—না বহুজীবনের ভিতর দিয়া সেই একই সত্তা অবিচ্ছিন্ন প্রকাশ লাভ করে ? এইখানে জাগে আমাদের ভিতরে একটি 'শাশ্বত'-বোধ —এই জীবসত্তা একান্তভাবেই কালস্রোতে একটা ভাসমান সত্তামাত্র নহে —ইহার একটি শাশ্বত রূপ আছে—ইহাই হইল আত্মা। এই সকল আত্মার পিছনে রহিয়াছেন আবার এক অখণ্ড আত্মা—তিনিই পরমাত্মা। হিন্দুদের ভিতরে কেহ কেহ বলিবেন যে, এই আত্মা সর্বদাই এক এবং অখণ্ড—জীব-রূপে তাহা কখনই খণ্ডিত হয় না ; জীবত্ব একটি গুণকর্মগত উপাধিমাত্র—উহা আমাদের দৃষ্টিকেই খণ্ডিত করিয়া এককেই বহুভাবে প্রতিভাত করে। অপরে বলিবেন, সেই এক পরমাত্মাই আত্মশক্তি বলে নিজেকে খণ্ডিত বা অংশরূপে পরিণত করেন—মূলে এক থাকিলেও পরিণতিতে ভেদ দেখা দেয়।

আমরা উপরে হিন্দু আত্মবাদের যে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করিলাম তাহার ভিতরে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, মূলে রহিয়াছে জীবন-প্রবাহ সম্বন্ধে একটি অবিচ্ছিন্নতা-বোধ এবং তাহার সহিত যুক্ত একটি একত্ববোধ (sense of continuity and identity)। বৌদ্ধ দার্শনিক তাঁহাদের অনাত্মবাদ স্থাপন করিতে গিয়া এই প্রচলিত অবিচ্ছিন্নতা এবং একত্বের সংস্কার এবং তজ্জনিত বিশ্বাসের উপরেই আঘাত করিয়াছেন। এই অবিচ্ছিন্নতা-বোধ এবং একত্ব-বোধ উভয়ই ভ্রান্তিজনিত। জীবনের কর্ম-প্রবাহই বলি বা চেতন-প্রবাহই বলি—কোথাও অবিচ্ছিন্নতা নাই—আছে পরস্পর পৃথক অস্তিত্ব সমূহের সন্ততি—অথবা দ্রুত-সঙ্ঘটনের ধারা। ক্ষুদ্র একটি বটের বীজ হইতে সহস্র কাণ্ড, শিকড়, শাখা-পল্লব বিস্তারিত যে বিরাট বটবৃক্ষের বিকাশ ইহার ভিতরে কোনও অখণ্ডতা নাই। প্রত্যেকটি ক্ষণের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব পৃথক্-কৃত, প্রতিক্ষণের মধ্যে পৃথক্-কৃত অস্তিত্ব সমূহের একটি সন্ততি (series) হইল এই বিরাট বটবৃক্ষটি ; কিন্তু ক্ষণের অতিদ্রুত পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে তাহার অস্তিত্বের দ্রুতপরম্পরা, পরম্পরার এই অতিদ্রুততার জন্য প্রতিক্ষণের অস্তিত্বের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না ; ইহারই ফলে আমরা সমস্ত জিনিসটিকেই একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ মনে করিয়া তাহার অস্তিত্বের প্রথমক্ষণ হইতে শেষক্ষণ পর্যন্ত একটি একত্বের আরোপ করিয়া থাকি। এই বৃক্ষ-জীবনের সম্বন্ধে যাহা সত্য আমাদের

মানবজীবনের সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। একদিনের শিশু এবং আশী বৎসরের বৃদ্ধটির জীবন জুড়িয়া যে অস্তিত্ব-প্রবাহ দেখিতে পাই তাহার ভিতরে কোথাও অবিচ্ছিন্নতা এবং আসল একত্ব নাই; প্রতিক্ষণেই তাহার অস্তিত্ব নব হইতে নবতর রূপ গ্রহণ করিতেছে; সুতরাং প্রতিক্ষণেই তাহার অস্তিত্ব তাহার পূর্বক্ষণের এবং পরক্ষণের অস্তিত্ব হইতে পৃথক্। একটি দ্রুত সন্নিহিতির সন্ততি তাহার সকল অস্তিত্ব-প্রবাহ এবং চেতন-প্রবাহের (বৌদ্ধরা ইহাকে বলিয়াছেন বিজ্ঞান-প্রবাহ) ভিতরে একটা কল্পিত অনবচ্ছিন্নতা এবং একত্ব দান করিয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রতিভাত হয় তাহার ব্যক্তি-সত্তা বা আত্মা—বৌদ্ধরা যাহার নাম দিয়াছেন পুদ্গল।

এই যে মানবজীবনের ত্রৈকালীন সন্ততি ইহাকে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক সময় তাঁহারা গঙ্গা-প্রবাহের উদাহরণ দিয়াছেন। হিমালয়ের কোন দুর্গম কন্দর হইতে এই প্রবাহের প্রথম যাত্রা—কত যুগ যুগ ধরিয়া কত পার্বত্যভূমি, বনাঞ্চল, নগর-পল্লীর ভিতর দিয়া কত বিচিত্র প্রবাহে সে চলিয়া আসিয়াছে—আমরা তাহার সমগ্র প্রবাহকে জুড়িয়া একটি এক এবং অখণ্ড অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইয়াছি। আসলে তাহার কোনও দিন কোথাও কোনও এক এবং অখণ্ড অস্তিত্ব ছিল না। তাহার যে স্রোত তাহা পরস্পর সন্নিহিত অসংখ্য অস্তিত্বস্রোত মাত্র। সেই অসংখ্য অস্তিত্বের প্রবাহ লইয়া সে যেমন এক বলিয়া প্রতিভাত হয়, মানুষের জীবন-প্রবাহের ভিতর দিয়াও মানুষ তেমন করিয়াই এক বলিয়া প্রতিভাত হয়। আবার আমরা দেখিতে পাই, সন্ধ্যাবেলায় আমরা একটি প্রদীপ জ্বালিয়া দিলাম; তাহার জ্বলন-ক্রিয়া প্রতি-মুহূর্তেই পৃথক্; তথাপি প্রদীপটি সারারাত্র ধরিয়া যখন জ্বলিতে থাকে তখন আমরা বলি, সন্ধ্যার প্রদীপটিই প্রথম প্রহরের প্রদীপ,—প্রথম প্রহরের প্রদীপই নিশীথের প্রদীপ, নিশীথের প্রদীপই আবার শেষ রাত্রির প্রদীপ। আসলে যাহা রহিল জ্বলন-প্রবাহমাত্র তাহাকেই আমরা প্রদীপের একত্ব বলিয়া ভুল করিতেছি। দৃষ্টান্তটি আর একটু অন্য রকম করিয়া বলিলে এক্ষেত্রে আমাদের ভুলটা আরও অধিক স্পষ্টরূপে চোখে পড়িবে। ধরা যাক্, আমরা একটি দীপ হইতে অপর আর একটি দীপ জ্বালাইয়াছি, অপরটি হইতে আবার পৃথক্ আর একটি দীপ জ্বালাইয়াছি—এইরূপ অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া তাহাদিগকে পরস্পর অতি সন্নিকটে ক্রমান্বয় একটি সরলরেখায় স্থাপিত করিয়া একটু দূর হইতে যদি তাহাদের প্রথমটি হইতে শেষটির প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে আমরা

দেখিতে পাইব বহুদূর বিস্তৃত একটি প্রদীপের রেখা ; আসলে সেখানে সেই প্রদীপ-ধারার ভিতরে নিরবচ্ছিন্নত্বও আমাদের দেখার ভুল, একত্বও আমাদের দেখার এবং বিচারের ভুল।

কিন্তু তাহা হইলে বৌদ্ধধর্মে 'ব্যক্তি-সত্তা' বা 'আমি' বলিয়া কি কোনও কিছুকেই স্বীকার করা হয় না ? হয় বৈ কি, পুদ্গলই হইল এই 'আমি'। কিন্তু এই পুদ্গলের বা 'আমি'র কোনও আসল সত্তা নাই, পঞ্চস্কন্ধকে অবলম্বন করিয়া তাহার একটা ব্যবহারিক সত্তা মাত্র প্রতীত হয়। আসলে এই 'আমি' বা ব্যক্তিসত্তার পিছনে কোনও আত্মা নাই, এই 'আমি' আসলে 'নাম-রূপ' ছাড়া আর কিছুই নহে। নাম-রূপ হইল জড় ও চেতন স্কন্ধসমূহের সমবায়ে প্রতিভাত লোকব্যবহারের উপযোগী একটা তাৎকালিক সত্তা-প্রতীতি মাত্র। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের সমবায়ে গঠিত আমাদের ব্যক্তিসত্তা ; এখানে গঠিত শব্দের অর্থ এই নয় যে, এই পঞ্চস্কন্ধ একত্রিত হইয়া আমাদের 'ব্যক্তি' নামক একটি স্বতন্ত্র-সত্তাকে উৎপন্ন করে ; গঠিত শব্দের অর্থ হইল, এই পঞ্চস্কন্ধ একত্রিত হইলে তাহা হইতে ব্যবহারিক বা সাংবৃতিক ভাবে আর একটি ব্যক্তিসত্তা বা পুদ্গলের প্রতীতি মাত্র হয়। এই তত্ত্বটি প্রসিদ্ধ 'মিলিন্দপঞ্হো' গ্রন্থের একটি চমৎকার আখ্যানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই, রাজা মিলিন্দ শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'হে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু, আপনার নাম কি ?' নাগসেন বলিলেন, 'আমার নাম নাগসেন'। কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই নাগসেনের খেয়াল হইল, রাজা 'আমার নাম নাগসেন' শুনিয়া হয়ত মনে করিতে পারেন যে, তাহা হইলে আমাদের এই পঞ্চস্কন্ধাত্মক অবয়বের মধ্যে 'আমি' বলিয়া একটি সত্তাকারের কোনও সত্তা রহিয়াছে এবং 'নাগসেন' নামটি দ্বারা সেই সত্তাটিকেই লক্ষ্য করা হইতেছে ; এই মনে করিয়া ভিক্ষু নাগসেন বলিলেন, 'মহারাজ, এই নাগসেন একটি নাম মাত্র বা লোকের ব্যবহারিক সুবিধার জন্য গৃহীত একটি সংজ্ঞা মাত্র ; এই নাগসেন নামের দ্বারা কোনও ব্যক্তিকে বা অবয়বের অন্তর্নিহিত কোনও অবয়বীকে বুঝাইতেছে না।

কিন্তু নাগসেনের এই জবাবে রাজা মিলিন্দ অধিকতর ধাঁধার ভিতরে পড়িয়া গেলেন। যদি দেহের মধ্যে কোনও দেহী কেহ না থাকে তবে যাহা কিছু সব উপভোগ করে কে ? যতসব শাস্ত্রবিহিত ভাবনা-অভ্যাস—তাহাই বা কে করে ? সাধনার জন্য আমরা যে মার্গ অবলম্বন করি সেই মার্গফলই বা প্রত্যক্ষ করে কে ? জীবনের সকল কর্মের পিছনে যদি একজন কর্তা না

থাকে তবে কুশল-অকুশল কর্মই বা কে করে—তাহার ফলই বা কে ভোগ করে ? আর কর্তা বা ভোক্তা যদি নাই থাকে তবে কর্মের কুশলত্ব অকুশলত্বই বা স্থির হইবে কি করিয়া ?—কারণ কর্তার উপরে কর্মফলের অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দ্বারাই ত আমরা কর্মের কুশলত্ব বা অকুশলত্ব নির্ধারণ করি। আর যদি ব্যক্তিসত্তা বলিয়া কোনও জিনিসই না থাকে তবে আচার্যই বা কে, উপাধ্যায়ই বা কে, উপসম্পদাও বা কাহার হয় ? সুতরাং রাজা মিলিন্দ বলিলেন,—'হে ভিক্ষু, আপনি আমার সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তকে আরও সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া আপনার বক্তব্যকে আরও রহস্যাবৃত করিয়া কথা বলিবেন না, আপনি স্পষ্ট করিয়া কথা বলুন,— আপনি যে বলিলেন আপনি নাগসেন বলিয়া জ্ঞাত —এই নাগসেন এখানে কে ? আপনার মাথার চুলগুলি কি নাগসেন ?'

নাগসেন উত্তর করিলেন,—'না মহারাজ।'

'তবে কি আপনার লোম, নখ, দন্ত, ত্বক্‌, মাংস প্রভৃতির কোনটি নাগসেন ?'

উত্তর হইল—'না।'

'তবে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধ নাগসেন ?'

উত্তর হইল—'না।'

'তবে কি মহাশয়, এই রূপ, বেদনাদি পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি হইল নাগসেন ?'

'তাহাও নয়।'

তখন বিভ্রান্ত রাজা বলিলেন, 'হে ভদন্ত নাগসেন, আমি আপনার নিকটে নাগসেন কে, নাগসেন কে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে নাগসেনকে আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তবে কি নাগসেন একটা শব্দ মাত্র ? নাগসেন তাহা হইলে অলীক—মিথ্যা,—নাগসেন বলিয়া কোথাও কোনও কিছুই নাই।'

বৃদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন মহারাজ মিলিন্দের মনোভাব বেশ বুঝিতে পারিলেন। মহারাজ মিলিন্দ এখানে তৎকালীন সংশয়াচ্ছন্নচিত্ত সাধারণ জনসমাজেরই প্রতিনিধি। নাগসেন বুঝিতে পারিলেন, বিতণ্ড তর্কের দ্বারা বিষয়টি মহারাজ মিলিন্দকে বুঝান যাইবে না ; তাই তিনি একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি কোনও ক্ষত্রিয়-কুমার, সুকোমল আপনার দেহ ; এখন মধ্যাহ্ন বেলা, ভূমি তপ্ত হইয়া গিয়াছে,—উষ্ণ বালুকার উপরে তীক্ষ্ণ কাঁকর এবং ভগ্ন মৃৎপাত্র—এই সমূহ আপনি আপনার কোমল পায়ে মর্দিত করিয়া আসিয়াছেন ; সম্ভবতঃ আপনার চরণ উপহত—দেহও বোধ হয় আপনার ক্লান্ত।' এ-কথা শুনিয়া মিলিন্দ বলিলেন,— 'না, আমি পায়ে হাঁটিয়া

আসি নাই, আমার রথে চড়িয়া আসিয়াছি—আমার কিছুমাত্র ক্লান্তি হয় নাই।' কথাটি শুনিয়াই নাগসেন বলিলেন,— 'বেশ কথা, আপনি যদি রথে চড়িয়া আসিয়া থাকেন তবে এই রথ বস্তুটি কি জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ। বলুন রথ কি,— ঈশ, অর্থাৎ সামনের লম্বা দণ্ডটিই কি রথ?' রাজা বলিলেন,— 'না মহাশয়।'

নাগসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে অক্ষ (রথচক্রের মধ্যমণ্ডল), অথবা চক্র অথবা পঞ্জর, দণ্ড, যুগ, রজ্জু, প্রতোদ-দণ্ড প্রভৃতির কোনটি কি রথ?'

মিলিন্দ বলিলেন, —'না ইহার কোনটিই রথ নয়।'

'তবে কি এইগুলির সমষ্টি হইল রথ?'

'তাহাও নয়।'

এইবারে নাগসেন বলিলেন,— 'মহারাজ, আপনি যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া শেষ পর্যন্ত নাগসেনকে কোথাও দেখিতে পান নাই, আমিও তেমনই জিজ্ঞাসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া কোথাও ত রথ দেখিতে পাইলাম না। আমিও ত তবে আপনার ন্যায় বলিতে পারি, রথ একটি শব্দমাত্র; রথ একান্তই একটি মিথ্যা—একটি অলীক পদার্থ—এখানে রথ বলিয়া কোন বস্তুই নাই।'

রাজা তখন বলিলেন,— 'না' আমি মিথ্যা বলি নাই,— রথ একেবারে মিথ্যা বস্তু নয়; ঈশ, চক্র, অক্ষ প্রভৃতি সমুদায়ের সমবায়ে— সকলের সুসম্বদ্ধতা দ্বারা রথ বলিয়া একটি প্রতীতি জাগ্রত হয়; ইহা প্রতীতি বা সংজ্ঞামাত্র— ইহা একটা ব্যবহার ও নাম মাত্র।'

তখন নাগসেন উৎসাহিত হইয়া বলিলেন,—'বেশ, বেশ মহারাজ, আপনি দেখিতেছি রথ কি তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানেন। ঠিক এইভাবেই রূপ এবং বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের সমবায়েই জাগিয়া ওঠে একটি নাগসেনের প্রতীতি বা সংজ্ঞামাত্র। ইহা সম্পূর্ণই লোক-ব্যবহার বা নাম মাত্র; পরমার্থতঃ এখানে কোনও পৃথক্ ব্যক্তি-সত্তা বা অবয়বী-স্বরূপ লোক বা কোনও আত্মা উপলব্ধ হয় না।'

এখানে দেখিতেছি, রথের কোনও অবয়বে বা তাহার সমগ্র অবয়বের সন্নিবেশের ভিতরে 'রথ' বলিয়া আসলে কোনও পৃথক্ বস্তু নাই, শুধু সমগ্র সন্নিবেশকে বুঝাইবার জন্য রথ একটি বস্তুহীন প্রতীতি বা লোকব্যবহার মাত্র, ব্যক্তিপুরুষ বা আত্মাও আমাদের পঞ্চস্কন্ধের সন্নিবেশকে বুঝাইবার জন্য একটা নাম মাত্র। আসলে আমরা দেখিতে পাই, বহির্বিশ্বে আমাদের পূর্ববর্তী গাছের দৃষ্টান্তে বা নদীর দৃষ্টান্তে যেমন কেবল একটি সত্তা-সন্ততি মাত্র রহিয়াছে, প্রাণীর

ক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া মানুষের ক্ষেত্রে—শুধুমাত্র একটা সত্তা-সন্ততিই নাই—তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিজ্ঞান-সন্ততি (বিজ্ঞান অর্থে এখানে চেতনা) রহিয়াছে। এই যে আমাদের বিজ্ঞান-সন্ততি সে প্রতি-মুহূর্তে পৃথক্‌ হইয়াও স্মৃতির ভিতর দিয়া একটা ঐক্যরূপে প্রতীত হয়—সেই প্রতীতি হইতেই জাগে আমাদের ব্যক্তিপুরুষ বা আত্মার কল্পনা; বৌদ্ধগণের মতে সে ব্যক্তিপুরুষ বা আত্মা আমাদের কল্পনাই মাত্র—আর কিছুই নহে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং তজ্জনিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে হিন্দুধর্মের বিশ্বাস এই, অন্তর্যামী পরমাত্মাই একমাত্র বেত্তা—ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়গ্রহণের দ্বার মাত্র। চক্ষুর ভিতর দিয়া সেই বেত্তা আত্মাই দেখেন, কর্ণের ভিতর দিয়া তিনি শোনেন, নাসিকার ভিতর দিয়া তিনি ঘ্রাণ গ্রহণ করেন। এই ভাবটি অবলম্বন করিয়াই 'কেন-উপনিষদে' বলা হইয়াছে—

'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রংমনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্যপ্রাণ শ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।'

'তিনিই হইলেন শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু।'

কিন্তু বৌদ্ধগণ ইন্দ্রিয়াদির পশ্চাতে এই বেত্তা বলিয়া কোনও কিছু স্বীকার করেন না। 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো'তে নাগসেনকে রাজা মিলিন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'বেদগূ' উপলব্ধ হন কি না। নাগসেন রাজাকে বলিলেন,—'বেদগূ' নামে সে আবার কে মহারাজ?' মিলিন্দ বলিলেন,—

"যো ভন্তে, অব্‌ভন্তরে জীবো চক্‌খুনা রূপং পস্‌সতি, সোতেন সদ্দং সুনাতি, ঘাণেন গন্ধং ঘায়তি, জিব্‌হায় রসং সায়তি, কায়েন ফোট্‌ঠব্‌বং ফুসতি, মনসা ধম্মং বিজানাতি।"—অর্থাৎ,—'অভ্যন্তরে এই যে জীব, যে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে, শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ শোনে, ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায়ের দ্বারা স্পর্শনীয় বস্তু স্পর্শ করে, মনের দ্বারা ধর্মকে বিশেষভাবে জানে।' এই বিশ্বাস সেই ঔপনিষদিক ধর্মেরই বিশ্বাস। আমরা প্রাসাদের মধ্যে থাকিয়া যেমন সর্বদিকের বাতায়নগুলি খুলিয়া দিয়া সব বাতায়নপথেই বাহিরের দৃশ্যকে গ্রহণ করিতে পারি, অভ্যন্তরস্থ বেত্তাও তেমনই ইন্দ্রিয়দ্বারে সব কিছু দেখিতে পান। ইহার জবাবে নাগসেন যে প্রতিপ্রশ্নসমূহ দ্বারা রাজাকে নিরস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রিয়গুলি যদি অভ্যন্তরস্থ বেত্তার বিষয়গ্রহণ নিমিত্ত দ্বারমাত্র হইত তবে বেত্তা ইচ্ছা করিলে যে কোনও দ্বারপথে বিষয়াদিকে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শন করিতে পারিতেন। কিন্তু বেত্তার পক্ষে তাহা যখন সম্ভব

হয় না তখন বুঝিতে হইবে দর্শন ক্রিয়া চক্ষুর্দ্বয় এবং রূপাদির উপরেই নির্ভর করে, শ্রবণ ক্রিয়া কর্ণদ্বয় ও বহিঃশব্দাদির উপরেই নির্ভর করে,—আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শনাদির ক্ষেত্রেও তাহাই। সুতরাং ইহার ভিতর আবার বেত্তারূপ কোনও আত্মা স্বীকার করিবার প্রয়োজনই করে না—সেই বেত্তা-পুরুষ আমাদের বিকল্পমাত্র।

বৌদ্ধ পুনর্জন্ম-রহস্য

বৌদ্ধেরা পুনর্জন্মবাদী ; কিন্তু তাঁহারা আত্মায় বিশ্বাস করেন না ; এক মৃত্যুহীন আত্মাই যে জন্ম-জন্মান্তরে দেহ হইতে দেহান্তর লাভ করে এ কথা কোনও বৌদ্ধশাস্ত্রেই স্বীকৃত নয়। কিন্তু আত্মারূপ কোনও এক এবং শাশ্বত বস্তুকে স্বীকার না করিয়া পুনর্জন্ম স্বীকার করিলে কতকগুলি সমস্যা এবং সংশয় আসিয়া দেখা দেয়। সমস্যা হইল এই, এক জন্মের পরে আবার যে জন্ম হয় তাহা কাহার জন্ম ? যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার জন্ম, না একেবারে নূতন কাহারও জন্ম ? যখন শাশ্বত বস্তু কিছুই নাই, তখন যাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহারই আবার পুনর্জন্ম স্বীকার করা যায় না। আবার যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে সে যদি একেবারেই নূতন হয় তবে ত বিপদ আরও বেশী। আমার মৃত্যুর পরে আমার কর্মফলে যদি অপর কাহাকেও জন্মিয়া বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয়, তবে আমি কুশল কর্মই বা করিব কেন, অকুশল কর্মই বা করিব কেন ? আমার কর্মফলের ভোগ যদি অপর কাহাকেও আসিয়া করিতে হয় তবে আমার দায় কোথায় ? আমার নীতি-ধর্ম প্রভৃতিই বা তাহা হইলে দাঁড়ায় কি করিয়া ?

এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে বৌদ্ধদর্শনে আলোচনা আছে নানা রকমে ; কিন্তু 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' গ্রন্থখানিতে নানা গল্পোপাখ্যানের দৃষ্টান্ত দিয়া সমস্যাটির একটি ভারি সুন্দর লোকপ্রিয় ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রাজা মিলিন্দ ভদন্ত নাগসেনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'যে উৎপন্ন হয় সে কি যে মরিয়া গিয়াছিল ঠিক সে-ই, অথবা অন্য ?' নাগসেন উত্তর করিলেন,— 'ঠিক সে-ই নয়, আবার অন্যও নয়।' রাজা মিলিন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সংশয় বাড়িয়াই গেল ; তিনি বলিলেন,— 'মহাশয়, উপমা দিন।' নাগসেন তখন দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'আচ্ছা মহারাজ, আপনি যে এক সময়ে অতি শিশু ছিলেন, শয্যায় চিৎ হইয়া শুইয়া খেলা করিতেন, আর আজ আপনি কত বড় হইয়াছেন ; সেই শিশুটিই কি আপনি ?' রাজা বলিলেন, 'না ভদন্ত এক নই ; অন্য ছিল সেই শিশু, আর অন্য হইলাম আমি পরিণত বয়স্ক লোকটি।' নাগসেন বলিলেন, 'তাহাই

যদি হয়, অর্থাৎ শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের মানুষের ভিতরে যদি কোনও ঐক্যের যোগসূত্র না থাকে, তবে সংসারে কেহ কাহারও মাতা হয় না, কেহ কাহারও পিতাও হয় না; শিল্পবান্, শীলবান্, প্রজ্ঞাবান্ কিছুই হয় না; কারণ, প্রতি মুহূর্তে কর্ম করে একজনে, পর মুহূর্তে তাহার ফলভোগ করে অপরে। শিল্প, শীল, প্রজ্ঞার অনুশীলন করে একজনে, সে অনুশীলনের ফলভোগ করে অপরে। শুধু তাহাই নহে; মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণ পরিবর্ধিত হইতে থাকে তখন সেই এক ভ্রূণের কলল, অর্বুদ, পেশী, ঘন প্রভৃতি বিভিন্নাবস্থাতে তাহার মা হইয়া পড়ে বিভিন্ন ব্যক্তি—কারণ কোনও দুই ক্ষণেই ত মানুষ একই থাকিয়া যায় না। এক মানুষে কুশল কর্ম করিবে, অন্য মানুষে পুণ্যবান্ হইবে; এক মানুষে শিল্প শিক্ষা করিবে, অন্য মানুষে শিক্ষিত হইবে, এক মানুষে পাপকর্ম করিবে, অন্যের হস্তপদাদি কাটা যাইবে। সুতরাং এই সকল বিচার করিলে শিশু এবং বৃদ্ধ ইহারা একেবারেই দুই নয়, যেই আমি শিশু ছিলাম সেই আমিই বৃদ্ধ হইয়াছি, এই কথাই স্বীকার করিতে হয়।'

নাগসেনের সকল কথার তাৎপর্য হইল এই যে, মানুষের বা কোন প্রাণীর অথবা কোনও জড়বস্তুর প্রত্যেক মুহূর্তের পরিবর্তনের ভিতর দিয়া যদিও সে ঠিক একই থাকিতেছে না, তথাপি যেহেতু সকল অবস্থান্তরই পূর্ব অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয় সেই জন্য পূর্বের সহিত পরবর্তীর একটা যোগ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। আসলে এই যোগ হইল একটা প্রবাহগত যোগ মাত্র। রাজা মিলিন্দ নাগসেনের এই কথার তাৎপর্যও স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,—'আরও উপমার দ্বারা বুঝাইয়া দিন।' তখন নাগসেন আবার একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেন। যেমন একজন লোক রাত্রে একটি প্রদীপ জ্বালাইল। আমরা বলি প্রদীপটি সারারাত্রিই জ্বলে। কোন্ প্রদীপটি সারারাত্রি জ্বলিল? আসলে কিন্তু রাত্রির পূর্বযামে যে প্রদীপটি ছিল, মধ্যযামে তাহা ছিল না; মধ্যযামে যাহা ছিল, পশ্চিমযামে (শেষ রাত্রে) তাহা থাকে না; অথচ তাই বলিয়া আমরা এ কথাও বলি না যে, প্রদীপটি পূর্বযামে অন্য ছিল, মধ্যযামে আবার অন্য ছিল, পশ্চিমযামে পুনরায় অন্য ছিল। যেহেতু পূর্বযামের প্রদীপটি হইতেই মধ্যযামের তথা পশ্চিমযামের প্রদীপের প্রবহণ, এই জন্য পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিমের ভিতরেও একটা প্রবাহগত যোগকে স্বীকার করিতে হয়। এই ভাবেই হইল সকল অস্তিত্ব-প্রবাহ; এই ভাবেই ধর্ম-সন্ততির প্রবাহ—একটি বিনষ্ট হয়—অন্যটি—উৎপন্ন হয়,—অপূর্ব আশ্চর্য হইল এই প্রবাহ,—যাহা হয় তাহা ঠিক পূর্বের জিনিসও নয়—আবার ঠিক অন্য জিনিসও নয়।—'এবমেব

খো মহারাজ, ধম্ম-সন্ততি সন্দহতি; অঞ্ঞো উপ্পজ্জতি, অঞ্ঞো নিরুজ্ঝতি; অপুব্বং অচরিমং বিয় সন্দহতি। তেন ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো পচ্ছিম-বিঞ্ঞাণসংগহং গচ্ছতীতি।'

মহারাজ মিলিন্দের অনুরোধে নাগসেন আবার আরও দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার বক্তব্যকে পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলেন। যেমন দুহ্যমান দুগ্ধ কালান্তরে দধিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়, সেই দধি হইতেই নবনীত হয়, নবনীত হইতেই ঘৃত হয়; একদিকে যেমন আমরা এ-কথা বলিতে পারি না যে যাহা দুধ তাহাই দধি, যাহা দধি, তাহাই নবনীত, বা যাহা নবনীত তাহাই ঘৃত,—আবার একথাও বলিতে পারি না যে, দুগ্ধ হইতে বিবিধ অবস্থা পরম্পরার ভিতর দিয়া উৎপন্ন ঘৃতের দুগ্ধের সহিত কোনই যোগ নাই। এইরূপই হইল ধর্ম-সন্ততি,—এইরূপই হইল মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের প্রবাহ।

প্রশ্ন হইল, এইভাবে পুনরুৎপন্ন হয় কে? জবাবে বলা হইল 'নাম-রূপ।' কিন্তু কোন্ নাম-রূপ? এই জীবনের নাম-রূপই কি? ঠিক তাহা নয়; এই নামরূপ দ্বারা শোভন কর্ম বা পাপকর্ম করা হয়, তাহারই ফলে অন্য নামরূপের উৎপত্তি হয়। বলা যাইতে পারে, এক নামরূপের কর্মের দ্বারা যদি অন্য নামরূপের উৎপত্তি হয় তবে যে নামরূপ পাপকর্ম করে তাহার ত মুক্তি হয়—বন্ধনগ্রস্ত হয় অন্য নামরূপ। কিন্তু থের নাগসেনের মতে যেহেতু এক নামরূপের কর্মের দ্বারাই একটি পুনর্জন্ম অপরিহার্য হইয়া ওঠে তখন পূর্ব নামরূপ মুক্ত হইল এমন কথা বলা যায় না। এই সত্যই আবার কতগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝান হইল।

যেমন একটি লোক অন্য একটি লোকের ফলের বাগানে প্রবেশ করিয়া তাহার আম চুরি করিল। যাহার আম সে চোরকে ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া গেল এবং নালিশ করিল,—'মহারাজ, এই লোকটি আমার আম চুরি করিয়াছে।' কিন্তু অপহরণকারী লোকটি বলিল,—'নাহং দেব ইমিস্‌স অম্বে অবহরামি; অঞ্ঞে তে অম্বা যে ইমিনা রোপিতা, অঞ্ঞে তে অম্বা যে ময়া অবহটা; নাহং দণ্ডপত্তো'তি।'—'হে দেব, আমি ইহার আম্র অপহরণ করি নাই; অন্য হইল সেই আম যে আম এ রোপন করিয়াছিল—আর অন্য হইল সেই আম যাহা আমি অপহরণ করিয়াছি; অতএব আমি ত দণ্ডপ্রাপ্ত হইব না।' এই স্থলে কি লোকটি দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে না? অবশ্যই হইবে। কেন হইবে? যেহেতু পরবর্তী আমগুলি পূর্ববর্তী আম হইতেই জাত হইয়াছে, এই জন্য পরবর্তী আমগুলি গ্রহণ করিলেও সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। এইরূপে ঠিক এই

একইভাবে এই বর্তমান নামরূপের দ্বারা লোক কর্ম করে—শোভন কর্মও করে—পাপ কর্মও করে—সেই কর্ম হইতে জাত নাম-রূপের জন্যই পূর্ববর্তী নাম-রূপেরও মুক্তি স্বীকার করা চলে না।

আবার যেমন একটি লোক হেমন্তকালে আগুন জ্বালিয়া আগুন না নিভাইয়াই চলিয়া গেল; সেই আগুন গিয়া অন্য একটি লোকের ক্ষেত্র দগ্ধ করিল; সেই ক্ষেত্রস্বামী প্রথম লোকটিকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া বলিল, 'মহারাজ, এই লোকটি আমার ক্ষেত্র পোড়াইয়া দিয়াছে।' লোকটি বলিল,—'না মহারাজ, আমি ইহার ক্ষেত্র পোড়াই নাই, আমি যে আগুন জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম তাহা এক আগুন, আর যে আগুন ইহার ক্ষেত্র পোড়াইয়া দিয়াছে তাহা হইল সম্পূর্ণ অন্য আগুন; সুতরাং এ বিষয়ে আমি দণ্ডনীয় নই।' সে ক্ষেত্রে কি সে দণ্ডনীয় হইবে না? অবশ্যই হইবে। অথবা যেমন একটি লোক প্রদীপ জ্বালিয়া এক মঞ্চের উপর ভোজন করিতেছিল, প্রদীপটি জ্বলিতে জ্বলিতে একটি তৃণকে জ্বালাইয়া দিল—তৃণটি জ্বলিতে জ্বলিতে ঘর জ্বালাইয়া দিল, ঘর জ্বলিয়া সমস্ত গ্রামকেই জ্বালাইয়া দিল। গ্রাম্যলোক তখন সেই লোকটিকে ধরিয়া বলিল,—'কেন তুমি সমস্ত গ্রামটি পোড়াইয়া দিলে?' সে বলিল,—'না হে, আমি গ্রাম পোড়াই নাই, আমি যে প্রদীপের আলোতে বসিয়া ভোজন করিতেছিলাম সে হইল এক অগ্নি; আর যে আগুন সমস্ত গ্রাম পোড়াইয়া দিয়াছে তাহা হইল অন্য অগ্নি।' এইরূপে সেই লোকটি এবং গ্রামবাসিগণ বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে কাহার পক্ষ গ্রহণ করা উচিত? গ্রামবাসি-গণের পক্ষই অবলম্বন করা উচিত। কেন করা উচিত? যেহেতু এই লোকটির প্রদীপাগ্নি হইতেই পরবর্তী অগ্নি প্রসূত হইয়াছে এই কারণেই। একটি নাম-রূপের সহিত পরবর্তী নামরূপের সম্পর্কও ঠিক সেইরূপই।

আবার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। যেমন কোনও একটি লোক একটি ক্ষুদ্র শিশু-বালিকাকে বরণ করিয়া বিবাহের জন্য শুল্ক দিয়া রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বালিকাটি দেখিতে দেখিতে অনেক বয়স প্রাপ্ত হইল; তখন অন্য একটি লোক আসিয়া মেয়েটিকে পুনরায় শুল্ক দিয়া বিবাহ করিল। বিবাহের পরে প্রথম লোকটি আসিয়া বিবাহকারী দ্বিতীয় লোকটিকে বলিল,—'হে মূর্খ পুরুষ, তুমি কেন আমার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছ?' দ্বিতীয় লোকটি বলিল,—'নাহং তব ভরিয়ং নেমি; অঞ্‌ঞা সা দারিকা দহরী যা তয়া বারিতা দিন্নসুঙ্কা চ; অঞ্‌ঞায়ং দারিকা মহতী বয়প্পত্তা ময়া বারিতা চ, দিন্নসুঙ্কা চা'তি।'—'আমি তোমার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছি না; অন্য হইল

সেই শিশুকন্যা যাহাকে তুমি বরণ করিয়াছিলে—এবং শুল্ক (পণ) দিয়াছিলে ; আর অন্য হইল এই অনেক বয়সপ্রাপ্তা কন্যা—যাহাকে আমি শুল্ক দিয়া বরণ করিয়াছি।' এইরূপে যদি এই লোক দুইটি বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে কোন্ লোকটির পক্ষ অবলম্বন করা সমীচীন ? নিশ্চয়ই প্রথম লোকটির। কেন ? যেহেতু এই শিশু বালিকা হইতে এই বয়ঃপ্রাপ্তা যুবতীর উৎপত্তি ; সেই কারণেই বয়সের সকল পরিবর্তনশীলতা স্বীকার করিয়াও শিশুকন্যা এবং যুবতীর ভিতরে একটা যোগ স্বীকার করিতে হয়। মানুষের বিভিন্ন জন্মান্তরের ক্ষেত্রেও এই একই সত্যকে স্বীকার করিতে হয়।

আবার যেমন একটি লোক একটি গোপালকের নিকট হইতে দুধ কিনিয়া আবার তাহারাই নিকটে রাখিয়া চলিয়া গেল,—বলিয়া গেল, কাল আসিয়া লইয়া যাইব। পরের দিনে সে দুধ দধি হইয়া গেল। লোকটি আসিয়া গোপালককে বলিল,—'আমার দুধের কলসীটি দাও।' গোপালক আনিয়া তাহার দধি দেখাইল। লোকটি বলিল,—'না, আমি ত তোমার নিকট হইতে দধি কিনি নাই,—দুধ কিনিয়াছি, আমি আমার দুধ চাই।' গোপালক বলিল, —'আমার অজানিতেই তোমার দুধ দধি হইয়া গিয়াছে।' সে লোকটি কিছুতেই শুনিল না। এইভাবে লোক দুইটি বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে কাহার পক্ষ অবলম্বন করা উচিত ? গোপালকের পক্ষই। কেন না, দুধ হইতেই এই দধি উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং দুধ যাহার দধিও তাহার। ঠিক এইরূপই হইল বিভিন্ন জন্মের নামরূপের সহিত সম্পর্ক।

সমস্ত আলোচনার ভিতর দিয়া মোটামুটিভাবে দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধেরা ক্ষণিকবাদী, সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই যে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনের ভিতর দিয়া রূপান্তরিত এবং ধর্মান্তরিত হইয়া যাইতেছে এ-কথা তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহারা এই সকল রূপান্তর ও ধর্মান্তরের ভিতর দিয়াও একটা যোগকে স্বীকার করিয়াছেন ; অপূর্ব আশ্চর্য হইল এই যোগ ; কি করিয়া এই প্রবাহগত যোগ সাধিত হয় তাহা বলা যায় না, কিন্তু যোগটিকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না, এবং এই যোগটিকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া ওঠে সকল কুশল-অকুশল, পাপ-পুণ্য ও ধর্মাধর্মের মতামত।

বৌদ্ধ কর্মবাদ

কর্মবাদ বৌদ্ধদর্শনের একটি মূল কথা। এই কর্মবাদের কথা আমরা বহুক্ষেত্রে বহুভাবে শুনিয়াও থাকি, বলিয়াও থাকি, কিন্তু কর্মবাদ সম্বন্ধে আমাদের মনে অনেক সময়ই কতগুলি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ এই কর্মবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এই প্রসঙ্গে কর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন জাগে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট আলোচনা বেশি দেখিতে পাই না। পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে একটি ধর্মসন্ততি নিরুদ্ধ হইয়া অপর একটি ধর্মসন্ততি কিরূপে প্রবাহিত হয় সে সম্বন্ধে অনেক সময় বলা হইয়াছে, 'অপূর্ব আশ্চর্য' ভাবে এইরূপ সংঘটিত হইয়া থাকে। 'অপূর্ব আশ্চর্য' বলিবার তাৎপর্য এই, সর্বদা ইহাকে নৈয়ায়িক পন্থায় বুঝাইয়া বলা শক্ত।

আমরা সাধারণভাবে একটি লোকের জন্ম এবং মৃত্যুকে যে-ভাবে গ্রহণ করি বৌদ্ধ সাধক বা দার্শনিকগণ সে অর্থে জন্ম-মৃত্যুকে গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে জন্ম হইল একটি পঞ্চস্কন্ধাত্মক প্রবাহের আরম্ভ, মৃত্যু সেই প্রবাহের একটি ছেদ—পুনর্জন্ম হইল সেই ছেদের ভিতর দিয়া যে একটি কর্ম প্রবাহ ছিল সেই কর্মপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া পুনরায় একটি পঞ্চস্কন্ধাত্মক ধর্মপ্রবাহের আরম্ভ। কিন্তু সাধারণভাবে এবং অতি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে এই প্রশ্ন আসে যে, একটি লোকের যখন মৃত্যু হয় এবং তৎপরে আবার তাহার কর্মফলে যে একটি পুনর্জন্ম হয়, এই কর্মফলের স্বরূপ কি এবং তাহা কিভাবে থাকে, কিভাবেই বা একটি পুনর্জন্ম ঘটাইয়া তোলে। হিন্দুগণ আত্মায় বিশ্বাস করেন এবং তাহার সহিত স্থূলদেহের অতীত একটি সূক্ষ্মদেহ এবং তাহারও পরে কারণদেহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। স্থূলদেহের বিনাশ হইলেই আত্মা সম্পূর্ণ বিদেহী হইল এমন কথা বলা যায় না,—সম্পূর্ণ বিদেহী হইলে ত আত্মা মুক্তিই লাভ করিত। সাধারণ জীবের ক্ষেত্রে স্থূলদেহের বিনাশের পর একটি অতি সূক্ষ্মদেহ আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া বিশ্বাস, এই দেহকেই বহু স্থলে লিঙ্গদেহ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই লিঙ্গদেহের ভিতরেই সকল কর্মফল বাসনা সংস্কাররূপে লীন থাকে. সেই

বাসনা-সংস্কারই আবার অনুরূপ স্থূলদেহ পরিগ্রহ করে। এইভাবে দেখিলে হিন্দুমতে মৃত্যুর পরে কর্ম কি করিয়া থাকে এবং বীজরূপে নূতন জন্মের কারণ হয় তাহা বোঝা যাইতে পারে। কিন্তু বৌদ্ধমতে যখন আত্মার কোনও প্রকারের স্বীকৃতি নাই, তখন মৃত্যুর পরে কর্মফল কিরূপে থাকে এবং কিরূপে সে নূতন জন্মের কারণ হয় সে সম্বন্ধে সংশয় উৎপন্ন হয়।

এ-প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতে পারি। একবার এই প্রশ্নটি লইয়া একজন দার্শনিকের সহিত আলোচনা হইয়াছিল, আলোচনায় আমরা একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যার কথা তুলিয়াছিলাম। সে ব্যাখ্যাটি এই,—আমাদের জীবদেহের এবং জৈবিক প্রবাহের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে দেখিতে পাই, যখনই যে কর্ম হয়, তাহা শারীরিকই হোক বা মানসিকই হোক, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমগ্র জৈবিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি পরিবর্তন আসে—সমগ্র জৈবিক ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই চেষ্টা করে তাহাকে তাহার নিজের ব্যবস্থা-বিধানের মধ্যে একীভূত করিয়া লইতে—সেই একীভূত করিয়া লইতে হইলে নিজের মধ্যে চাই একটা বনাইয়া লইবার (adjustment) চেষ্টা—সেই চেষ্টায় আবার নিজের ভিতরেই আসে একটা পরিবর্তন—এই পরিবর্তনই দেখা দেয় একটা নূতন সৃষ্টি রূপে। আমাদের জীবনের যত কর্ম সেই কর্মের দ্বারা বিশ্ব-জীবনের ভিতরেই আসে একটা পরিবর্তন—তাহা যত সামান্যই হোক না কেন। এই পরিবর্তন আসলে ব্যক্তিজীবনের কর্মেরই স্বীকৃতি। তাহা হইলে বলা যায়, আমরা যখনই কোন কাজ করি তাহা বিশ্বজীবনের কতগুলি পরিবর্তন রূপে বিধৃত হইয়া (recorded) থাকে। এই বিধারণই আসলে 'চিত্রগুপ্তে'র খাতার লেখা। কোনও কোনও মতে এই কর্মফল আকাশপটে ইথিরীয় স্পন্দনরূপে রক্ষিত হইয়া একটি বিশেষ ছাঁচ সৃষ্টি করে – এই ছাঁচই ভবিষ্যৎ নব নব প্রাণী-জন্মের মৌলিক কারণ। আমরা সে কথা বিশ্বাস না করিলেও এ-কথা বলিতে পারি যে, কর্মফল যখন একটি বিশ্বজীবনের পরিবর্তনরূপে বিধৃত হয় তখন এই বিধৃতিই একটা পুনর্ব্যবস্থাপনার (readjustment) তাগিদে নব নব অস্তিত্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া ওঠে। বৌদ্ধ কর্মবাদ এবং কর্মফলজনিত পুনর্জন্মবাদের সম্বন্ধে এইরূপ একটা ব্যাখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে কর্মফলের এই-জাতীয় একটি ব্যাখ্যার কোথাও তেমন কোনও অনুমোদন মেলে না।

কর্মবাদের সমস্যাটিকে সাধারণতঃ দুইভাবে দেখা যাইতে পারে, একটি হইল ইহজীবনের কর্মফল, অন্যটি হইল 'অদৃষ্ট' বা গতজীবনের কর্মফল। ইহার

ভিতরে বর্তমান জীবনের কর্মফলের সমস্যা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ বর্তমান জীবন-প্রবাহের ভিতরে পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত সংস্কার-বিজ্ঞানের প্রবাহ রহিয়াছে —কর্ম এই সংস্কার-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই প্রবাহিত হইতেছে এবং একটি বিশেষ জীবনের ধর্ম-সন্ততির ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। প্রশ্নটি জটিল হইয়া দেখা দেয় গত জীবনের কর্ম সম্বন্ধে। কিন্তু এ-বিষয়ে মনে হয় মূল বৌদ্ধদর্শনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, গত জীবনের কর্মও এই সংস্কার-বিজ্ঞানের প্রবাহকে অবলম্বন করিয়াই এক জীবন-প্রবাহ হইতে অন্য জীবন-প্রবাহে প্রধাবিত হয়। কর্ম আসলে কোনও বাহ্যিক বস্তু নহে, কতগুলি বাহ্যিক পরিবর্তনকেও কর্ম বলে না। বৌদ্ধশাস্ত্রে কর্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,— 'চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি'। অর্থাৎ 'চেতনাকেই আমি কর্ম বলিয়া থাকি।' পঞ্চস্কন্ধকে আমরা যদি 'নাম-রূপ' ভাবে দুইভাগে ভাগ করিয়া লই তবে বলিতে পারি, কর্ম রূপাশ্রয়ী হইতে নামাশ্রয়ীই অধিক। এই জন্য সংস্কার এবং বিজ্ঞান-স্কন্ধকেই আমরা কর্মের প্রধান আশ্রয় বলিতে পারি। কৃত কর্মকে অবলম্বন করিয়া পঞ্চস্কন্ধের সমবায়ে একটি জীবনস্রোত প্রবাহিত হইল; এই সমবায়-জাত প্রবাহ নিরুদ্ধ হইলে সমগ্র স্রোতটিই থামিয়া যায় না— সংস্কার-বিজ্ঞানের প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া কর্মের প্রবাহ চলিতেই থাকে; সেই কর্মপ্রবাহই বীজরূপ হইয়া অনুরূপ পঞ্চস্কন্ধাত্মক একটি নূতন জীবযাত্রাকে সম্ভব করিয়া তোলে। এই জন্যই বৌদ্ধ পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে কোথাও কোনও ছেদের কল্পনা নাই। একটি জীব-প্রবাহ নিরুদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারই একটা বিস্তৃতিরূপে অন্য জীব-প্রবাহ আরম্ভ হয়। এইজন্য প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যাতেও বলা হইয়াছে, 'একটি নিরুদ্ধ হয়, অপরটি উৎপন্ন হয়।' অবশ্য এক্ষেত্রেও একটা প্রশ্ন করা যাইতে পারে,—কর্ম পূর্বে না জন্ম পূর্বে? আমরা বলিয়া থাকি, জন্মের জন্যই কর্ম হয়, আবার বলি, কর্মের জন্যই জন্ম হয়। কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে? আসলে এই প্রশ্নটাই একটা বড় ভ্রান্তিমূলক, কারণ জন্ম এবং কর্ম-প্রবাহ উভয়ই অনাদি— অনাদি অবিদ্যাতেই উভয়ে বিধৃত। যাহা স্বভাবতঃই অনাদি—প্রতীত্যসমুৎপাদ-ক্রমে যাহা নিয়ত আবর্তিত তাহার ভিতরে আবার আগে পরের প্রশ্ন আসে কি করিয়া? বাঙলা চর্যা-গীতির মধ্যেও সরহপাদ এই কথাটি অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—একটি গীতিতে :—

অক্ষে ণ জাণহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥

জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো॥
*   *   *
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণন্তি অচিন্ত সো ধাম॥

"অচিন্ত্যযোগী আমরা জানি না, জন্ম মরণ ভব কি করিয়া হয়। যেরূপ জন্ম, সেই রূপই মরণ; জীবন্তে আর মৃতে কিছুই বিশেষ নাই।...জন্ম দ্বারা কর্ম হয় কি কর্ম দ্বারা জন্ম হয়,— সরহ বলিতেছে,— অচিন্ত্য সেই ধাম।"

আমরা দেখিতে পাই, কর্মকে সর্বদাই 'ভববীজ' বলা হইয়া থাকে। কর্মকে এই বীজরূপে অভিহিত করায় নানা দিক হইতে তাৎপর্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ সূক্ষ্ম একটি বীজের মধ্যে যেমন একটি বিরাট্ মহীরুহের সুদীর্ঘ এবং সুবিস্তৃত পরিণতির সম্ভাবনা লুকাইয়া থাকে, সংস্কার-বিজ্ঞান অবলম্বনে কর্মবীজের মধ্যেই তেমনই সর্বসত্ত্বের ভবিষ্যৎ সকল সম্ভাবনা লুক্কায়িত থাকে। বীজের পার্থক্যে যেমন বৃক্ষের পার্থক্য হইয়া থাকে, কর্মপার্থক্যেই তেমনই জীবের পার্থক্য এবং তাহাদের আয়তন আদিরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। 'মিলিন্দপঞ্‌হো'র মধ্যে এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা দেখিতে পাই। রাজা মিলিন্দ প্রশ্ন করিতেছেন,— 'ভদন্ত নাগসেন, এই যে পঞ্চ আয়তন সমূহ ইহারা কি নানা কর্মের দ্বারা নিবর্তিত হয়, না এক কর্মের দ্বারা?' নাগসেন উত্তর করিলেন,—'হে মহারাজ, নানা কর্মদ্বারাই নিবর্তিত হয়, এক কর্মের দ্বারা নহে। একটি ক্ষেত্রে যেমন পাঁচটি বীজ যদি রোপিত করা হয়, তবে সেই নানা বীজ হইতে নানা ফল উৎপন্ন হইবে— তেমনই এই পঞ্চ আয়তন নানারূপ কর্মের দ্বারাই নিবর্তিত হয়, এক কর্মের দ্বারা নহে। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, সংসারে সকল মানুষ সমান নহে, কেহ অল্পায়ু, কেহ দীর্ঘায়ু; কাহারও কাহারও জীবনে অল্প বিঘ্ন, কাহারও জীবন বহু বিঘ্নসমাকুল; কেহ দুর্বর্ণ, কেহ বর্ণবন্ত, কেহ অল্প শক্তিমান্, কেহ বহুশক্তিমান্; কাহারও অল্পভোগ, কাহারও মহাভোগ, কেহ নীচকুলীন, কেহ মহাকুলীন, কেহ দুষ্প্রজ্ঞ, কেহ প্রজ্ঞাবন্ত। মানুষের ভিতরে এই বিবিধ জাতীয় ভেদের কারণ হইল কর্মবীজের ভেদ। বৃক্ষ সমূহের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব, সকল বৃক্ষ সমান নয়; কোনটি অম্ল, কোনটি লোনা, কোনটি তিক্ত, কোনটি কটু, কোনটি কষায়— কোন কোনটি আবার মধুর। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ যেমন মূলবীজের পার্থক্য, মানুষের ক্ষেত্রে সকল পার্থক্যের

মূলও তেমনই কর্মবীজ। আবার আমরা আরও লক্ষ্য করিতে পারি, মূলবীজও ক্ষেত্র, পরিবেশ এবং চাষের পার্থক্যে বিভিন্ন ফল ধারণ করিতে পারে। একটি বীজকে যদি একটি সুকৃষক গ্রহণ করিয়া উর্বর ক্ষেত্রে বপন করে, ক্ষেত্রে ভাল চাষ করিয়া, আগাছা নিড়াইয়া দিয়া, সার দিয়া, ভাল জল আলোর ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে তবে তাহার ফল একরূপ দেখা দিবে; কিন্তু সমজাতীয় বীজকেই যদি অলস এবং অপটু কৃষক গ্রহণ করিয়া অযত্নে অনুর্বর ক্ষেত্রে বপন করে তবে তাহার ফল বহুলাংশে পৃথক্ হইবে। মনুষ্যের কর্মবীজের সম্বন্ধেও সেই কথা। কোনও কুশল বা অকুশল কর্মের বীজ যদি উপযুক্ত পাত্র দ্বারা অনুকূল পরিবেশে পরিবর্ধিত হয় তবে সে বীজ একরূপ ফলপ্রসূ হইবে, অন্যথায় অন্যথা হইবে। সুতরাং কর্মবীজও সংসারে তাহার অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে নানাপ্রকার পরিবর্তন গ্রহণ করিতে পারে। রাজা মিলিন্দ ভদন্ত নাগসেনকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'এই (বর্তমান) নাম-রূপের দ্বারা কুশল বা অকুশল কর্ম করা হয়, সেই কর্মসমূহ কোথায় থাকে?' নাগসেন উত্তর করিয়াছিলেন,— 'অনুবন্ধেয্যুং খো মহারাজ, তানি কম্মানি ছায়া'ব অনপায়িনী'তি।'— অর্থাৎ 'সেই কর্মসমূহ অনপায়িনী (অপরিত্যাগিনী) ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে।' মিলিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'সেই কর্মসমূহকে কি দেখাইতে পার যে, এইখানে এইখানে সেই কর্মসমূহ আছে?' নাগসেন বলিলেন, না, তাহা দেখান যায় না। যেমন বৃক্ষ-প্রবাহের ভিতরে যে সব বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হয় নাই সেই বৃক্ষের ফল কোথায় আছে দেখান সম্ভব নহে— তেমনই সন্ততির (কর্মপ্রবাহের) অবিচ্ছেদ-হেতু দেখান সম্ভব নয় যে, এইখানে এইখানে কর্ম আছে। অর্থাৎ এই প্রবাহের ভিতরেই সেই কর্ম ফলের ন্যায় প্রকাশ লাভ করে—আবার কর্মবীজরূপে পরিণত হয়—কর্মবীজ হইতে আবার জন্ম হয়—এইরূপে চলিতে থাকে অবিচ্ছেদ সন্ততি।

নিজের ভবিষ্যৎ উৎপত্তি জানা যায় কি-না প্রশ্ন করিলে নাগসেন বলিয়াছিলেন, যে তাহা জানা যায়। যেমন কৃষক যদি ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষেপ করে, আর দেবতা (মেঘের দেবতা) ভাল বর্ষণ করিবে তাহা যদি জানিতে পারে, তবে সে জানিতে পারে যে ক্ষেত্রে ধান্য হইবে; যে জন্মগ্রহণ করে সেও তাহার কর্মদ্বারা ও কর্মবিকাশের অনুকূলতা দ্বারা জানিতে পারে যে তাহার উৎপত্তি হইবে।

আমাদের সকল কর্ম বিধৃত আমাদের তৃষ্ণায়—তৃষ্ণা বিধৃত অনাদি অবিদ্যায়। এই তৃষ্ণার যথার্থ পরিচয় লাভ করিয়া একবার যদি এই

তৃষ্ণাজনিত কর্মপ্রবাহকে রুদ্ধ করা যায় তাহা হইলেই সকল ক্লেশের অবসান ঘটিবে। ভগবান্ বুদ্ধদেবের এ বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ উক্তি রহিয়াছে,—

অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং॥
গহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
ভগ্গা তে ফাসুকা সব্বা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা॥

"গৃহকারককে (দেহরূপ গৃহের কারককে) খুঁজিয়া খুঁজিয়া এই সংসারে পুনঃ পুনঃ অনেক জন্মলাভ করিলাম—দুঃখকর এই পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ। হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি,—পুনরায় আর গৃহ রচনা করিতে পারিবে না; তোমার সকল পার্শ্বাস্থি (পাঁজর) ভগ্ন হইয়াছে, গৃহকূট বিসংস্কৃত হইয়াছে; বিসংস্কৃত (বিগত সংস্কার) হইয়াছে আমার চিত্ত—সকল তৃষ্ণা হইয়াছে ক্ষয়প্রাপ্ত।" এই গৃহকারক কে? গৃহকারক অনাদি অবিদ্যাজাত তৃষ্ণা; এই তৃষ্ণাই সকল কর্মের প্রেরক; কর্ম চিত্তসংস্কার উৎপন্ন করে—চিত্তসংস্কারই আবার ভাবিজন্মের মূল কারণ। এই তত্ত্বটি বুঝিতে পারিলেই এবং এই তৃষ্ণাত্যাগে অকুশল কর্মবিরহিত হইতে পারিলেই জন্মবন্ধনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এই সম্যক্ দৃষ্টি বা প্রজ্ঞা একবার লাভ করিতে পারিলে তাহার পরে করুণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে সর্বজনহিতে কুশলকর্ম তাহা আর চিত্তে সংস্কার সৃষ্টি করিয়া বন্ধনের কারণ হয় না, এবং এইজন্য বোধিসত্ত্বগণের যে কুশল কর্ম তাহা কখনই তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হয় না।

এই যে কর্মসংস্কার পরিত্যাগের দ্বারা দুঃখ নিরোধের চেষ্টা ইহা কখন করণীয়? বিশেষ কোনও কাল-প্রাপ্ত হইয়া ইহা করণীয়, না সর্বদাই ইহা করণীয়? কালাকালের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সর্বদাই ইহা করণীয়। 'মিলিন্দপঞ্হো'তে কতগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া এই সত্যটি অতি সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে। যদি কেহ পিপাসার্ত হয়, তখন কি সে জল পান করিব বলিয়া কূপ, পুষ্করিণী বা দীঘি প্রভৃতি খনন করিতে প্রবৃত্ত হয়? তাহা নহে—জলপিপাসা পাইতে পারে মনে করিয়া সর্বদাই তাহার জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়। ক্ষুধার্ত হইয়া কি কেহ ভাত খাইব বলিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করায়, শালিধান বপন করে এবং ধান কাটিয়া আনে? জৈবিক-প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া সর্বদাই মানুষ আহার্যের ব্যবস্থার জন্য সচেতন হয়। সংগ্রাম

উপস্থিত হইলে কি কেহ তখন তখন পরিখা নির্মাণ করাইতে, প্রাকার নির্মাণ করাইতে, গোপুর নির্মাণ করাইতে এবং অট্টালিকাদি নির্মাণ করাইতে বা রসদাদি সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হয়? তখন কি কেহ হাতী-ঘোড়া শিক্ষিত করিয়া রথ, ধনুক প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে বসে? কুশলী নৃপতি সর্বদাই সচেতন এবং সক্রিয় হইয়া পূর্ব হইতেই ইহার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রাখে। কুশলী লোকও সেইরূপ কর্মসংস্কার ত্যাগের জন্য যে যথোপযুক্ত 'ব্যায়াম' তাহা সর্বদাই করিয়া থাকেন, কোনও কালাকালের জন্য অপেক্ষা করেন না।

কুশলধর্মের তাৎপর্য

মহাযান বৌধধর্মে আমরা নানাভাবে পারমিতার কথা দেখিতে পাই। খ্রীষ্টপরবর্তী যুগের বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহে, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রে আমরা এই পারমিতার নানাভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। কোনও কোনও শাস্ত্র ছয়টি পারমিতা, কোনও শাস্ত্র দশটি পারমিতার উল্লেখ করিয়াছে। যাঁহারা ছয়টি পারমিতার কথা বলেন তাঁহারা দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা —এইগুলিকে পারমিতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; পরবর্তী কালে ইহার সহিত উপায়কৌশল্য, প্রণিধান, বল ও জ্ঞান—এই চারিটি পারমিতা যুক্ত করিয়া পারমিতার সংখ্যা দশ করিয়া লওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ জাতক-গল্পগুলি ও খ্রীষ্টপরবর্তী বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, এই ছয় বা দশ গুণের সম্যক্ অনুশীলন দ্বারাই বোধিসত্ত্ব ক্রম-উর্ধ্বাবস্থা লাভ করেন। পরবর্তী বৌদ্ধধর্মে— বিশেষ করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মে এই পারমিতার অনুশীলনের উপরে খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। 'পারমিতা' শব্দের মূল অর্থ 'পূর্ণতা প্রাপ্ত' (পারমিং গতো, অথবা পারমিন্নতো); দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা প্রভৃতি গুণের পূর্ণতা লাভ হইলেই একে একে উচ্চভূমি লাভ হইতে থাকে।

প্রাচীন পালি সাহিত্যে আমরা এই পারমিতাবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই না; একটি সুপ্রতিষ্ঠিত 'বাদ' রূপে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এই পারমিতা-বাদের উৎপত্তি বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপরবর্তী প্রথম শতকে রচিত সুপ্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ 'মিলিন্দপঞ্‌হো'তেও এই পারমিতাবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই না। পারমিতার বদলে আমরা কতকগুলি কুশলধর্মের উল্লেখ দেখিতে পাই; শীল, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও সমাধিই হইল পঞ্চ কুশল-ধর্ম। এই পঞ্চ কুশলধর্মের বর্ণনার পরেই দেখিতে পাই প্রজ্ঞার লক্ষণ বর্ণনা। এই পঞ্চ কুশলধর্মই তাহা হইলে পরিপূর্ণতার ভিতর দিয়া প্রজ্ঞায় পর্যবসিত হয়।

'মিলিন্দপঞ্‌হো'র মধ্যে এই পঞ্চ কুশলধর্মের যে ব্যাখ্যা রহিয়াছে তাহা স্থির এবং গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। শীল, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি

প্রভৃতি কথাগুলি বহু দিন হইতে বহুধা ব্যবহারের ফলে আমাদের নিকটে এখন প্রায় শব্দমাত্রেই পর্যবসিত হইয়াছে। ধর্মজীবনের অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই কুশলধর্মগুলির যে কি কাজ তাহা ভাল করিয়া না বুঝিতে পারিলে সামগ্রিক ধর্মজীবনকে গড়িয়া তোলাই সম্ভব নহে।

'মিলিন্দপঞ্‌হো'র ভিতরে দেখিতে পাই, প্রথমে 'শীলে'র লক্ষণ নির্ধারণ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে,—'পতিট্‌ঠানলক্খণং মহারাজ, শীলং'; শীল হইল প্রতিষ্ঠালক্ষণ। 'প্রতিষ্ঠা' শব্দের তাৎপর্য হইল, যাহাকে অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া অন্য সব কিছু বর্তমান থাকে। মূলতঃ শীলকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের অন্যান্য সকল কুশলধর্ম অবস্থান করে,—'সব্‌বেসং কুসলানং ধম্মানং ...শীলং পতিট্‌ঠা।' শুধু পঞ্চকুশল ধর্ম নয়, আমাদের যে সপ্তবিধ ইন্দ্রিয়বল, বোধির অর্থাৎ জ্ঞানের সকল অঙ্গ (বোধ্যঙ্গ), চতুর্বিধ নির্বাণমার্গ, চতুর্বিধ স্মৃত্যুপস্থান, সম্যক্‌ চেষ্টা (পধান), ঋদ্ধিপাদ (চৈতসিক শক্তির মূলাশ্রয়), ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তি—ইহার সকলেরই প্রতিষ্ঠা হইল শীল; অর্থাৎ শীল সম্যক্‌ অনুশীলিত না হইলে—শীলের দ্বারা প্রথমে ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে অন্য সাধনা সম্ভবই হয় না। সদাচার এবং কঠোর বিনয়নিষ্ঠা দ্বারা এই শীল লাভ হয়—ইহাই সর্বপ্রকার ধর্মসাধনার ভিত্তিভূমি। শীলস্বরূপ এই মূল ভিত্তি যদি দৃঢ় হয় তবে এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কুশলধর্ম কখনই পরিক্ষীণ হইতে পারে না; কিন্তু এই প্রতিষ্ঠাভূমি যদি দৃঢ় না হয় তবে অন্য কোনও ধর্মাঙ্গকে সবল করিয়া তুলিয়া আমরা কখনও কোনও স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারি না। ধরা যাক্‌ কেহ কঠোরভাবে ধ্যানপরায়ণ হইলেন; সাময়িক ভাবে এই ধ্যানপরায়ণতা দ্বারা হয়ত বা কোনও ফল লাভ হইতে পারে—কিন্তু শীলের দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই ধ্যানফল অল্পকাল মধ্যেই পরিক্ষীণ হইয়া যাইবে। কিন্তু এই পরিক্ষীণতা অপেক্ষাও বড় কথা মনে হয়, মূলে শীলপরায়ণ না হইয়া কোনও লোক সত্য সত্য ধ্যানপরায়ণ হইয়া উঠিতেই পারে না। ধ্যানের প্রয়োজনের জন্য যে মানসিক বলের প্রয়োজন, চিত্তবৃত্তির উপরে যে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার প্রয়োজন, শীল ব্যতীত তাহা সম্ভবই নহে।

শীলই কি করিয়া সকল কুশলধর্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ এ বিষয়ে আমরা চমৎকার কতকগুলি উপমা দেখিতে পাই। একটি উপমায় বলা হইয়াছে, যেমন আমরা দেখিতে পাই—বীজসমূহের তৃণ-লতা-বনস্পতিরূপে যে বৃদ্ধি এবং ক্রমবিপুলতা লাভ ঘটিতেছে, জীবসমূহের যত বৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ ঘটিতেছে তৎ-

সমূহই পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্বরূপ লাভ করিয়া ; পৃথিবীকে মূলাশ্রয়-রূপে লাভ না করিয়া বীজসমূহ বা জীবসমূহ কিছুতেই বৃদ্ধি বা বিপুলতা লাভ করিতে পারিত না। ঠিক এইরূপই শীলকে মূল প্রতিষ্ঠাভূমিরূপে লাভ না করিয়া শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি বা প্রজ্ঞা—ইহার কোনটারই সম্যক্ অনুশীলন বা প্রসারণ সম্ভব হয় না। যেমন বলসাধ্য কোনও কর্মের অনুশীলন করিতে হইলে দৃঢ়ভাবে পৃথিবীকে আশ্রয় না করিয়া তাহা সম্ভব হয় না, তেমনই কঠোর চেষ্টা দ্বারা আচরণীয় কুশলধর্মসমূহ শীলের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব হয় না। আবার আমরা দেখিতে পাই, একটি নগর নির্মাণ করিবার ইচ্ছা লইয়া কোনও নগরধর্কি প্রথমে কি করে? সে যদি যথার্থ নিপুণ শিল্পী হয় তবে প্রথমেই সে ভাল করিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ; সে প্রথম নগরস্থানকে শোধন করায়—গোঁজ, কাঁটা প্রভৃতি অপনীত করায় ; উঁচু-নীচু ভূমিকে সমতল করায় ; তাহার পরে সেই সংস্কৃত সমতল জমির এক অংশ বীথি, রাস্তার মোড়, চৌমাথা প্রভৃতি দ্বারা বিভাগ করে এবং তাহার পরেই নগরের নির্মাণ কার্যে হাতে দেয়। এইরূপ যে লোক নিজের জীবনে ধর্মের নগর সৃষ্টি করিতে চায়, তাহাকে প্রথমে শীলের দ্বারা জীবনভূমিকে শোধন করিয়া লইতে হইবে ; জীবনের জমিতে যত প্রকার গোঁজ, কাটা ইত্যাদি রহিয়াছে তাহা অপসারণ করিয়া লইতে হইবে, বাসনাবিক্ষুব্ধ বন্ধুর জীবনভূমিকে শান্ত-সমাহিত করিয়া লইতে হইবে, কিভাবে সমগ্র ধর্মজীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। নগর নির্মাণ করিতে হইলে যেমন একের নিরাপদ, স্বচ্ছন্দ এবং সানন্দ অবস্থানের জন্য গৃহাদি চাই—আবার তেমনই বহুর স্বচ্ছন্দ এবং সানন্দ গতিবিধির জন্য বীথি চাই, মোড় চাই—চৌমাথা চাই ; ধর্মজীবনের মধ্যেও এক এবং বহুকে বিধারণের জন্য সামগ্রিক আদর্শ এবং অনুকূল পন্থার প্রয়োজন। শীলই প্রথমে এই সামগ্রিক ধর্মজীবনের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করিয়া দিবে। এই জন্যই ভগবান্ বুদ্ধ নিজে শীল সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

অয়ং পতিট্‌ঠা ধরণীব পাণিনং
ইদঞ্চ মূলং কুসলাভিবুড্‌ঢিয়া।
মুখঞ্চি'দং সব্‌ব জিনানুসাসনে
যো সীলক্‌খন্ধো বরপাতিমোক্‌খিয়ো॥

ধরণী যেমন প্রাণিগণের প্রতিষ্ঠা—এই শীলও তেমনই প্রাণিসমূহের প্রতিষ্ঠা ; কুশলসমূহের বৃদ্ধিরও ইহাই মূল ; জিনগণের (যাঁহারা সব কিছু জয়

করিয়াছেন) সকল প্রকার অনুশাসনের ইহাই মূল (বা প্রধান),—এই শীলস্কন্ধই হইল শ্রেষ্ঠ প্রাতিমোক্ষ।

শীলের পরই শ্রদ্ধার কথা। শ্রদ্ধার লক্ষণ কি ? 'সম্পসাদন' (সম্প্রসাদন) এবং 'সম্পক্খন্দন' (সম্প্রস্কন্দন) হইল শ্রদ্ধার লক্ষণ। 'সম্প্রসাদন' শব্দের অর্থ হইল—সম্যক্‌রূপে প্রসাদন ; অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা উৎসাদন। কিরূপে শ্রদ্ধারূপ কুশলধর্ম সম্যক্ প্রসন্নতা সম্পাদন করে ? আমাদের প্রসন্নতা নষ্ট করে কোন্ কোন্ জিনিস ? চিত্তের মধ্যে কতকগুলি প্রতিবন্ধক দেখা দিয়াই চিত্তের এই প্রসন্নতাকে নষ্ট করে ; কাম, দ্বেষ, তন্দ্রা, গর্ব ও মোহই হইল পঞ্চবিধ প্রতিবন্ধক যাহা চিত্তের প্রসন্নতাকে নষ্ট করে। শ্রদ্ধা এই 'নীবরণ' বা প্রতিবন্ধক-সমূহকেই প্রতিবদ্ধ করে ; প্রতিবন্ধক দূর হইয়া গেলেই চিত্ত স্বচ্ছ হয়, বিশেষরূপে প্রসন্ন হয়, অনাবিল হয় ; এইরূপেই শ্রদ্ধা আমাদের সম্প্রসারণের কারণ হয়।

একটি উপমা দ্বারা কথাটিকে বুঝান হইয়াছে। ধরা যাক্, কোনও চক্রবর্তী রাজা যদি তাঁহার চতুরঙ্গ সেনা লইয়া পথের অগ্রে গমন করিতে অল্প জল পার হইয়া যান—তবে সেই অল্প জল অনেক হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকসমূহের দ্বারা ক্ষুভিত হইয়া আবিল, আন্দোলিত এবং পঙ্কিল হয়। এই সময়ে যদি সেই রাজার পিপাসা পায় এবং রাজা যদি জল প্রার্থনা করেন তবে তাঁহাকে কোন্ জল দেওয়া হইবে ? সেই রাজার যদি উদক-প্রসাদক অর্থাৎ জল-পরিষ্কারক মণি থাকে তবে সেই মণি জলে প্রক্ষিপ্ত করা হইবে ; আবিল জলে সেই প্রসাদকমণি নিক্ষিপ্ত হইলে সেই জলের ভিতরকার শঙ্খ, শৈবাল, পানা প্রভৃতি বিগত হইবে, কাদা নীচে পড়িয়া যাইবে ; জল তখন নির্মল, সুপ্রসন্ন ও অনাবিল হইবে। যেমন জল, তেমনই চিত্ত। যেমন ঐ জল-পরিষ্কারক লোকেরা—তেমনই হইলেন যোগী। শঙ্খ, শৈবাল, পানা, কাদা প্রভৃতি যেমন জল-মালিন্যের হেতু, ক্লেশও সেইরূপ চিত্তের মালিন্যের হেতু। এখানে শ্রদ্ধা হইল উদক-প্রসাদক মণির ন্যায় ; উদক-প্রসাদক মণি আবর্ত-আবিল জলে নিক্ষেপ করিলে জল যেমন নির্মলতা এবং প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়, ক্লেশসমূহের দ্বারা আবিল, চঞ্চল এবং ক্লিন্ন চিত্ত তেমনই শ্রদ্ধার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নির্মল এবং প্রসন্নতা লাভ করে। সমস্ত আলোচনাটিরই তাৎপর্য এই মনে হয়, শ্রদ্ধা হইল পরমশ্রেয় বিষয়ে পরম নিষ্ঠা ; শ্রেয়োবিষয়ে সেই পরম নিষ্ঠা দেখা দিলে চিত্ত হইতে ইতররাগ দূরীভূত হইয়া যায় ; অন্য সব রাগ বা আসক্তি দূরীভূত হইয়া গেলে কাম দ্বেষ আপনা হইতেই দূরীভূত হইয়া যায় ; শ্রেয়ের লক্ষ্যে চিত্ত

তখন অতন্দ্র হয়, প্রেয়ের আকর্ষণে সর্ব-মোহও দূর হইয়া যায়—বাকি থাকে তখন সমস্ত চিত্তে এক সুপ্রসন্নতা।

শ্রদ্ধাকে আর বলা হইয়াছে 'সম্প্রস্কন্দন' লক্ষণ। সম্প্রস্কন্দন শব্দের অর্থ উল্লম্ফন অর্থাৎ ক্ষুদ্র হইতে একেবারে কোনও মহৎ আকাঙ্ক্ষায় অধিরোহণ। এই সম্প্রস্কন্দন বা মহাকাঙ্ক্ষার তাৎপর্য হইল, আমরা অনেক সময়ই অনেক ভাল জিনিস বুঝি—তাহা আচরণ করিবারও চেষ্টা করি, কিন্তু খুব যেন আগাইতে পারি না; ইহার মূলীভূত কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই সব জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ ভাল জিনিস আমাদের মধ্যে সাধারণতঃ কোনও মহৎ-প্রেরণা উদ্রিক্ত করে না। কিন্তু প্রত্যক্ষে যদি এমন লোক দেখিতে পাই যাঁহার ভিতরে এই 'ভাল' যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—তখন সমগ্র মনপ্রাণে একটা নবীন প্রেরণা এবং একেবারেই একটা মহাকাঙ্ক্ষা অনুভব করি; ইহাই যথার্থ শ্রদ্ধা। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী বা অর্হত্ত্ব প্রভৃতিকে হয়ত আমরা মঙ্গলকর এবং আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া জানি; কিন্তু এ-সম্বন্ধে পড়িয়া বুঝিয়া এই সব অবস্থা লাভ করিবার জন্য যেন তেমন একটা তীব্র বেগ ভিতরে অনুভব করি না; কিন্তু যখন কেহ চোখের সম্মুখে এমন কাহাকেও পায় যাহার চিত্ত সত্যই বিমুক্তি লাভ করিয়াছে তখন স্রোতাপত্তি ফলে সকৃদাগামী ফলে অর্হত্ত্বে সহসা মহাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়; তখন অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য, অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞানের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মানুষ সর্ববিধ চেষ্টা নিয়োগ করে; ইহাই হইল যথার্থ শ্রদ্ধা।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। মনে করা যাক, একটি পর্বতের উপরে মহামেঘ বর্ষণ করিয়াছে, সেই পর্বতগাত্রের জল নিম্নে প্রবাহিত হইয়া পর্বতের সকল কন্দর এবং গভীর বিবরসমূহ পরিপূর্ণ করিয়া অবশেষে পার্বত্য নদীকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে; পরিপূর্ণ নদীর জল উভয় কূল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। মনে করা যাক বহুলোক এই নদীকে অতিক্রম করিবার জন্য আসিয়া সেই নদীর স্ফীততা ও গভীরতা না জানিয়া ভীত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। এখন এই তিতীর্ষু জনগণ যদি সহসা দেখিতে পায় যে কোনও এক পুরুষবর নিজের সামর্থ্য এবং বল বিচারপূর্বক দৃঢ়ভাবে কাপড় বাঁধিয়া উল্লম্ফনপূর্বক সেই নদী উত্তীর্ণ হইয়া যান, তবে তাঁহাকে উত্তীর্ণ দেখিয়া অপর সকলের মধ্যেও উৎসাহ ও শক্তির সঞ্চার হয়,—তাঁহার অবলম্বিত পন্থায় অপর সকলেও উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ইহাই হইল যথার্থ শ্রদ্ধা। ভীত সন্ত্রস্ত অল্পসত্ত্ব মানবসমূহকে যিনি

নিজের লোকোত্তর আদর্শে একেবারে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, জন-সমাজে তিনিই হইলেন যথার্থ শ্রদ্ধার্হ লোক। এই-জাতীয় শ্রদ্ধা সম্বন্ধেই 'সংযুক্তনিকায়ে' বলা হইয়াছে,—

সদ্ধায় তরতী ওঘং অপ্পমাদেন অন্নবং।
বিরিয়েন দুক্খং অচ্চেতি পঞ্ঞায় পরিসুজ্ঝতি ॥

শ্রদ্ধা দ্বারা প্রবাহ (প্লাবন) তরে, অপ্রমাদের দ্বারা অর্ণবকে অতিক্রম করে; বীর্যের দ্বারা দুঃখের অত্যয় ঘটে, প্রজ্ঞা দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।

কুশলধর্মের আলোচনায় শ্রদ্ধার পরেই আসিবে বীর্যের কথা। এই বীর্যের লক্ষণ কি? উপথম্ভন-লক্খণং মহারাজ, বিরিয়ং—'উপস্তম্ভন' —অর্থাৎ নিরোধ বা ধারণই হইল বীর্যের লক্ষণ। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, শীলেই হইল সকল কুশলধর্মের প্রতিষ্ঠা; কিন্তু বর্ধিত কুশলধর্মসমূহকে ধারণ করিয়া রখিবার একটি শক্তি চাই; বীর্যই হইল সর্বপ্রকার ধারণ-শক্তির প্রতীক,—এই বীর্যের দ্বারাই কুশলধর্মসমূহ বিধৃত হয়—কখনও পরিহীণ বা বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে না। বীর্য আমাদের দেহ-শক্তিকেও যেমন ধারণ করিয়া রক্ষা করে—আমাদের চিত্তশক্তিকেও সর্বথা ধারণ ও রক্ষণ করে। কতকগুলি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বীর্যের এই উপস্তম্ভন লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেমন ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইলেও গৃহ পতনোন্মুখ হয়, তখন সেই পতনোন্মুখ গৃহকে কাঠের দ্বারা ধারণ ও রক্ষণ করিতে হয়,—ঠিক তেমনই শীলে প্রতিষ্ঠিত কুশলধর্মসমূহকেও বীর্যের দ্বারা রক্ষা করিতে হয়। আবার দেখা যায়, যুদ্ধস্থলে যদি একটি মহতী সেনা একটি অল্প সেনাকে ভগ্ন করে তখন সেই অল্প সেনার অধিপতি রাজা অন্য অন্য সেনাকে অনুসরণ করান, পশ্চাতে প্রেরণ করান; তখন সেই নবপ্রেরিত সেনার সহিত পূর্বোক্ত অল্প সেনা যুক্ত হইয়া সেই মহতী সেনাকেই ভগ্ন করে। বীর্যের লক্ষণও এইরূপই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ধর্মজীবনে আমাদের যেখানে যেটুকু দুর্বলতা তাহাকে পশ্চাৎ হইতে নূতন শক্তির দ্বারা সবল করিয়া তুলিয়া সমগ্র ধর্মজীবনকেই প্রতিমুহূর্তে পতন বা বিচলনের পথ হইতে রক্ষা করিবে বীর্য। এই জন্যই ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন,—'হে ভিক্ষুগণ, বীর্যবান্ যে আর্য-শ্রাবক, তিনি অকুশলকে পরিত্যাগ করেন, কুশলকে ভাবনা করেন, দুষণীয়কে (সাবজ্জং) পরিত্যাগ করিয়া অনবদ্যকে ভাবনা করেন,—তিনি সতত নিজেকে শুদ্ধভাবে রক্ষা করেন!'

বীর্যের পরে স্মৃতির কথা। স্মৃতির লক্ষণ কি? স্মৃতির দুইটি লক্ষণ—একটি

'অপিলাপন' ও অপরটি 'উপগ্রহণ'। 'অপিলাপন' অর্থ হইল 'অভিলাপন' অর্থাৎ চিত্তিত বিষয়কে বলান, পর্যালোচনা করান। স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া কি করায়? স্মৃতি যাহার ভিতরে উৎপন্ন হয় তাহার চিত্তের সামনে স্মৃতি যেন দেখাইতে থাকে এইটা কুশলধর্ম, এইটা অকুশলধর্ম—ইহা সাবদ্য (দূষণীয়), এইটা নিরবদ্য, এইটা হীন, এইটা উত্তম, এইটা বিশদ, এইটা অবিশদ; স্মৃতি বার বার পর্যালোচনা করায়—এই চারিটি স্মৃত্যুপস্থান, এই চারিটি সম্যক্ প্রধান (চেষ্টা), এই চারিটি ঋদ্ধিপাদ, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এই পঞ্চ বল, এই সপ্ত বোধি-অঙ্গ, এই হইল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ইহা শান্তি, ইহা বিশেষ দর্শন, ইহা বিদ্যা —ইহা বিমুক্তি। স্মৃতি এই সকল বার বার মানসচক্ষের সামনে আনিয়া দিলে তখন যোগী ইহার মধ্য হইতে বাছিয়া সেবনীয় ধর্ম সেবন করেন এবং অসেবনীয় ধর্ম পরিত্যাগ করেন; ভজিতব্য ধর্মের ভজনা করে—অভজিতব্য ধর্মের ভজনা করে না। এই-জাতীয় অপিলাপনই হইল স্মৃতির কাজ।

এ বিষয়েও উপমার সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন, কোনও চক্রবর্তী রাজার ভাণ্ডাগারিক সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে তাঁহাকে তাঁহার সকল যশ এবং সমৃদ্ধি স্মরণ করাইয়া দেয়,—'হে দেব, আপনার এতগুলি হস্তী, এতগুলি অশ্ব, এতগুলি রথ, এতগুলি পদাতিক, এত পরিমাণ হিরণ্য, এত পরিমাণ সুবর্ণ ও এত পরিমাণ সম্পদ্ আছে—এই সব, হে দেব, আপনি স্মরণ করুন।' এইরূপে ভাণ্ডাগারিক রাজাকে নিত্য তাঁহার ধন বলায়—অর্থাৎ পর্যালোচনা করায়। ফলে রাজার কি আছে না আছে—এবং তাহার ভিতরকার কিসের দ্বারা কি করা যাইতে পারে না পারে, ইহা সর্বদাই রাজার মানসচক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়—রাজা তাঁহার প্রয়োজন ও পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা তাঁহার সমৃদ্ধির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। আমাদের স্মৃতি হইল আমাদের চিত্তভাণ্ডের ভাণ্ডাগারিকের ন্যায়—সে আমাদের চিত্তের ভিতরে কোথায় কোন্ ভাল-মন্দ শক্তি ও সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে বিষয়ে বার বার আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিয়া কোন্‌টা আমাদের সামগ্রিক ধর্মজীবনের অনুকূল—কোন্‌টা বা প্রতিকূল, কোন্‌টা বা গ্রহণীয়, কোন্‌টা বর্জনীয় তাহা নির্ধারণ করিতে সাহায্য করে। ইহাই হইল স্মৃতির অভিলাপন লক্ষণ।

স্মৃতির দ্বিতীয় লক্ষণ হইল 'উপগ্রহ'—অর্থাৎ ধারণ। স্মৃতির এই উপগ্রহণ লক্ষণ স্মৃতির অপিলাপন বা অভিলাপন লক্ষণের সঙ্গেই যুক্ত। উৎপদ্যমান স্মৃতি সর্বদা হিতাহিত ধর্মের গতি অন্বেষণ করে—সে সর্বদা দেখাইয়া দেয় এই সকল ধর্ম হিত, এই সকল অহিত; এই সকল ধর্ম উপকারক, এই সকল অনুপকারক।

ইহার ফলে যোগী অহিত ধর্মকে পরিত্যাগ করেন, হিত ধর্ম গ্রহণ করেন; অনুপকার ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং উপকার ধর্ম গ্রহণ করেন; এইরূপেই স্মৃতি আমাদিগকে নির্বাচনে এবং গ্রহণে সাহায্য করে। কোনও চক্রবর্তী রাজার শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক যেমন রাজার হিতাহিত সবই জানেন—এইগুলি বা ইহারা হিতকর; এইগুলি বা ইহারা অহিতকর; এইগুলি উপকারক, এইগুলি অপকারক; রাজা এই শ্রেষ্ঠ অধিনায়কের নিকটে সব জানিয়া গ্রহণীয়কে গ্রহণ এবং বর্জনীয়কে বর্জন করেন। আমাদের স্মৃতিও হইল সেইরূপ একটি শুভানুধ্যায়ী সেবক অধিনায়কশ্রেষ্ঠের মতন; সে সকল জানিয়া বুঝিয়া আমাদিগকে শুভের গ্রহণ ও অশুভের বর্জনে বুদ্ধি ও প্রেরণা দান করে। আমাদের ধর্মজীবনকে গড়িয়া তুলিতে স্মৃতির এতখানি প্রভাব বলিয়াই ভগবান্ বুদ্ধ স্মৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'সতিং চ খ্বাহং ভিক্খবে সব্বত্থিকং বদামী'—'স্মৃতিকে, হে ভিক্ষুগণ, আমি সর্বাথিক (সর্বার্থ-সাধন) বলি।'

ইহার পরে আসে সমাধির কথা। 'প্রমুখ-লক্ষণ' হইল সমাধি। 'প্রমুখ' শব্দের অর্থ হইল—যাহা সর্বাগ্রে, যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ—বা সকলেরই লক্ষ্য। সমাধিকে প্রমুখলক্ষণ বলা হয় এই কারণে যে, যত কুশলধর্ম আছে তাহারা সকলেই 'সমাধিপ্রমুখ'—অর্থাৎ সমাধিকে সামনে রাখিয়া বা লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা অগ্রসর হয়; আবার অন্যভাবে বলা যাইতে পারে—কুশল ধর্মসকল হইল 'সমাধিনিম্ন'; সমাধি-নিম্ন কথার তাৎপর্য হইল এই যে—উচ্চ ভূমিতে বিচিত্র গতিতে প্রবাহিত স্রোতস্বতী সমূহের ধারা যেমন নিম্নমুখী হইয়া এক সাগর উদ্দেশ্যে ধাবমান হয়, তেমনই কুশলধর্মসমূহ তাহাদের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি লইয়া সমাধির প্রতিই ধাবিত হয়। অথবা 'সমাধিনিম্ন' কথার তাৎপর্য হইল, যাহা সমাধির নিম্নে অবস্থিত; অর্থাৎ যাহা বা যাহারা সমাধির নিম্নে থাকিয়া সমাধিকে উর্ধ্বে ধারণ করিয়া রাখে। আবার বলা হইয়াছে, কুশলধর্মসমূহ হইল সমাধিপ্রবণ, অর্থাৎ সমাধির দিকেই তাহাদের ঝোঁক; তাহারা হইল সমাধিপ্রাগভার—অর্থাৎ সমাধির দিকেই হইল তাহাদের প্রধান ভার। নানাভাবে দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমাধির সহিত অন্যান্য কুশলধর্মসমূহের সম্পর্ক বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। একটি কূটাগারের ছাদের নিম্নস্থ কাষ্ঠসমূহ সেই শৃঙ্গের নীচে থাকিয়া এবং শৃঙ্গমুখী থাকিয়া সেই শৃঙ্গকেই ধারণ করে, কুশলধর্মসমূহও তেমনি সমাধি-উন্মুখ থাকিয়া সমাধিকে বহন করে। যেমন একজন রাজা যখন তাঁহার চতুরঙ্গ সেনা লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তখন যত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক রহিয়াছে তাহার মধ্যে ঐ রাজাই প্রমুখ হন—সেই

রাজার প্রতিই অন্ত সব নত থাকে—সকলেই যেমন তৎ-প্রবণ হয়, সেই রাজাতেই যেমন সকল চতুরঙ্গ সেনার প্রধান ভার থাকে—এবং তাহারা যেমন পর্যায়ক্রমে এই রাজার পশ্চাতেই অবস্থিত থাকে, কুশলধর্মসমূহও তেমনই সমাধিকে সম্মুখে রাখিয়া তাহারই অনুবর্তী রূপে তাহাকেই পূর্ণ করিয়া তোলে। সমাধির এই প্রমুখ লক্ষণের জন্ম ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন—'সমাধিং ভিক্খবে ভাবেথ সমাহিতো যথাভূতং পজানাতী'—'সমাধিকে, হে ভিক্ষুগণ, ভাবনা কর; সমাহিত ব্যক্তি যথাভূত (তত্ত্ব) জানিতে পারে।'

ইহার পরেই আসিবে প্রজ্ঞার কথা। প্রজ্ঞার লক্ষণ কি? প্রজ্ঞা হইল 'ছেদন-লক্ষণা'; প্রজ্ঞার দ্বিতীয় লক্ষণ হইল 'অবভাসন'। প্রজ্ঞা সর্বপ্রকার ক্লেশ ছেদন করে বলিয়াই প্রজ্ঞা ছেদ-লক্ষণ। আর প্রজ্ঞা অবভাসন কিরূপে? উৎপদ্যমান প্রজ্ঞা অবিদ্যারূপ অন্ধকার বিদূরিত করে, বিদ্যার অবভাসন বা প্রকাশন জন্মায়, জ্ঞানালোক দর্শন করায় এবং আর্যসত্যসমূহ প্রকটিত করে। ইহার ফলে যোগী কোন্‌টা অনিত্য, কোন্‌টা দুঃখ, কোন্‌টা অনাত্ম—ইহা সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিতে পান। যেমন যদি কোনও পুরুষ অন্ধকার গৃহে প্রদীপ প্রবেশ করায় সেই প্রবিষ্ট প্রদীপ যেমন সকল অন্ধকার বিদূরিত করে, আলোকের অবভাস উৎপন্ন করে, আলোককে বিশেষরূপে দর্শন করায় এবং রূপসমূহকে প্রকটিত করে, ঠিক সেই রকমই উৎপদ্যমান প্রজ্ঞা অবিদ্যা-অন্ধকার দূরীভূত করে, বিদ্যা-অবভাস উৎপন্ন করে, জ্ঞানালোককে বিশেষরূপে দেখায় এবং আর্যসত্যসমূহকে প্রকটিত করে।

আমরা উপরে প্রাচীন বৌদ্ধ মতের কুশলধর্ম সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম ইহার সহিত পরবর্তী কালের পারমিতাসমূহের যে পরিকল্পনা তাহা তুলনা করিলেই বোঝা যায় যে, প্রাচীন এই কুশলধর্মের আদর্শ হইতেই পরবর্তী কালের পারমিতাবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা যে 'মিলিন্দপঞ্‌হো'কে অবলম্বন করিয়া এই কুশলধর্মের আলোচনা করিলাম, সেই 'মিলিন্দপঞ্‌হো' হয়ত খুব প্রাচীন পালিগ্রন্থ না হইতে পারে, পণ্ডিতগণ ইহাকে সাধারণতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই 'মিলিন্দপঞ্‌হো'র মধ্যে প্রাচীন মতেরই অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই জন্ম ইহাকে আমরা বর্তমান আলোচনায় প্রাচীন মতের প্রতিনিধিভাবে গ্রহণ করিয়া প্রাচীন কুশলধর্মের আদর্শের একটা পরিচয় লইবার চেষ্টা করিলাম।

প্রতীত্যসমুৎপাদ

॥ ১ ॥

ভগবান্ বুদ্ধ যে সকল বিপ্লবাত্মক দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহার ভিতরে প্রধান হইল প্রতীত্যসমুৎপাদ-বাদ। সাধারণভাবে যেখানে মোটামুটি সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই কার্য-কারণ নিয়মকে বিশ্ব-প্রক্রিয়ার মূলীভূত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, বুদ্ধদেব সেখানে এই প্রতীত্যসমুৎপাদের (পালি পটিচ্চসমুপ্পাদ) মত স্থাপন করিয়াছিলেন। কার্য-কারণ নিয়মে বিশ্বাসই শাশ্বতবাদে পৌঁছাইয়া দেয়, সেই কার্য-কারণবাদের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়া বুদ্ধদেব শাশ্বতবাদের মূলেই কুঠারাঘাত করিলেন। বিশ্বজগৎ যে ঈশ্বর নামক কোনও নিত্য সর্বশক্তিমান্ পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট নয়, নিত্যা প্রকৃতি দ্বারাও রচিত নয়, নিত্যস্বভাব অণু-পরমাণুর সমবায়েও রচিত নয়—ইহা যে নিত্য-পরিবর্তিত একটা অস্তিত্ব-প্রবাহেই বিধৃত এই সত্য প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ-বাদ প্রচার করিলেন; বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ বা অশাশ্বতবাদ এই প্রতীত্যসমুৎপাদ-বাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতীত্যসমুৎপাদের দৃষ্টিই হইল বস্তু সম্বন্ধে সত্য দৃষ্টি; এই জন্য বলা হইয়াছে, 'যো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্সতি সো ধম্মং পস্সতি, যো ধম্মং পস্সতি সো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্সতি',—অর্থাৎ যে প্রতীত্যসমুৎপাদকে দেখে—অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদের তাৎপর্য অবগত হইয়া সেই দৃষ্টিতে বিশ্ব ব্যাপারকে দেখে ধর্মসমূহকে সে-ই সত্য দৃষ্টিতে দেখিতে পারে; আর ধর্মসমূহকে যে ভাল করিয়া দেখে সে-ই প্রতীত্যসমুৎপাদ দেখে; ধর্মসমূহকে ভাল করিয়া দেখিলে প্রতীত্যসমুৎপাদের সত্যেই গিয়া পৌঁছাইতে হইবে।

প্রতীত্যসমুৎপাদের মূল কথা হইল 'ইদপ্পচ্চয়তা'—অর্থাৎ একটা অস্তিত্ব-প্রত্যয় যেটা নির্ভর করে আর একটি বা আর কতগুলি বস্তু-প্রত্যয়ের উপরে; এই পূর্ববর্তী বস্তুপ্রত্যয়কে আমরা বলিতে পারি 'হেতু-প্রত্যয়'; এই হেতু-প্রত্যয় হইতে প্রতিভাত হয় আর একটি প্রত্যয়, তাহা হইতে অপরটি—তাহা হইতে

অপরটি—এইরূপে দেখা দেয় একটি অস্তিত্ব-প্রত্যয়ের নিরবচ্ছিন্ন সন্ততি—তাহা লইয়াই চলে এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ-ব্যাপার। ইহাকে একটা সূত্রাকারে উপস্থাপিত করিতে হইলে বলা যায়—'ইতি ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্সুপ্‌পাদা ইদং উপ্‌পজ্জতি'—'এইটা হইলে এইটা হয়, ইহার উৎপাদ হইতে এইটি উৎপন্ন হয়।' এখানে মৌলিক জিনিসটি লক্ষ্য করিতে হইবে এই যে, ইহার ভিতরে যথার্থ কোনও কার্যও নাই,—কোনও কারণও নাই; অর্থাৎ 'কারণ'টি 'কার্য-টিকে উৎপন্ন করিতেছে এ-কথা স্বীকার করা হইল না; কতগুলি জিনিস থাকিলে কতগুলি জিনিস হয়—সেগুলি থাকিলে অপর জিনিস হয়—এই রূপ। অবশ্য এই প্রসঙ্গে 'হয়' বা 'উৎপন্ন নয়' শব্দেরই বা তাৎপর্য কি তাহাও বিশেষভাবে আলোচ্য, সে আলোচনা আমরা পরে করিব। মূল কথা হইল, একটি সন্ততি বা প্রবাহের মধ্যে কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে তাহাই নির্দেশ করা যাইতে পারে—যেটি আগে তাহাই পরেরটিকে উৎপন্ন করিতেছে এবং সেইটিই কারণ তাহা বলা যায় না; কার্যকারণহীন ভাবে একটা অস্তিত্ব-প্রবাহ মাত্রই দেখা যায়।

যেমন একটি 'চক্ষুর্বিজ্ঞান' জাত হইল (জাত হইল অর্থ চক্ষুবিজ্ঞানের প্রতীতি হইল); কেন হইল? দুইটি চক্ষু আছে, বাহিরে রূপসমূহ আছে,—এই 'চক্খুংসি রূপাণি চ প্রতীত্য উৎপদ্যতে চক্ষুর্বিজ্ঞানম্'—এই চক্ষু ও রূপকে আশ্রয় বা অব-লম্বন করিয়া উৎপন্ন হইল চক্ষুর্বিজ্ঞান (visual perception); চক্ষু এবং রূপ চক্ষুর্বিজ্ঞানকে উৎপন্ন করে নাই—চক্ষু এবং রূপ আছে বলিয়া 'চক্ষুর্বিজ্ঞান' প্রতীত হইল। আবার চক্ষুবিজ্ঞান থাকিলেই তাহাকে অবলম্বন করিয়া জাগে একটি মনোবিজ্ঞান। এ-কথা বলা যায় না যে চক্ষুর্বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া (প্রতীত্য) যেখানে একটি মনোবিজ্ঞান দেখা দিল সেখানে সেই মনোবিজ্ঞানের প্রতি ঐ চক্ষুবিজ্ঞানই কারণ। এ কথা সত্য যে চক্ষুর্বিজ্ঞান আগে উৎপন্ন হয় এবং চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু চক্ষুর্বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে আজ্ঞা করে না যে, 'যথাহং উপ্পজ্জামি, ত্বম'পি তথ উপ্পজ্জহীতি, অথবা মনোবিজ্ঞানও চক্ষুর্বিজ্ঞানকে বলে না যে 'যথ ত্বং উপ্পজ্জিসপি, অহম'পি তথ উপ্পজ্জিস্‌সামীতি।' এই উভয়ের মধ্যে পরস্পরে কোনও আলাপই নাই—'অনালাপো তেসং অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞেহীতি' (মিলিন্দ-পঞ্‌হো)। অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কার্যকারণরূপে কোনও যোগাযোগ নাই—শুধু একটার পর একটা আসে—এই মাত্র। কিন্তু এইভাবে একটার পর একটা কেন আসে? তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে 'নিম্নত্তা চ মহারাজ, দ্বারত্তা চ চিণ্ণত্তা চ সমুদাচরিতত্তা চা'তি।'—অর্থাৎ 'নিম্নত্ব, দ্বারত্ব, চীর্ণত্ব ও সমুদাচরিতত্ব হেতু।' অর্থাৎ যে-হেতু

মনোবিজ্ঞান চক্ষুর্বিজ্ঞানের দিকে নিম্ন—অবনত, যেহেতু চক্ষুর্বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের দ্বার, যেহেতু মনোবিজ্ঞান চক্ষুর্বিজ্ঞানের অনুসরণ করে এবং যেহেতু চক্ষুর্বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সাহচর্যরূপ ব্যবহার আছে। 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো'তে দৃষ্টান্ত দিয়া দিয়া এগুলি বুঝান হইয়াছে। যেমন, প্রথম একদিন বর্ষা হইলে নিম্নদেশ দিয়াই জল যায়; ইহার পরে যত বৃষ্টি হইবে তাহাও ঐ একপথ দিয়াই যাইবে; পূর্ব জলধারা এবং পরবর্তী জলধারা সমূহের মধ্যে পরস্পরের কোনও আলাপ নাই—তথাপি তাহারা পর পর পরস্পরের ধারাকে অনুসরণ করিয়া চলে—ইহার কারণ তাহাদের স্বাভাবিক নিম্নগামিত্ব। চক্ষুর্বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই একই সত্য। তারপরে দেখা যায়; কোনও রাজার যদি একটি সীমান্ত নগর থাকে; তাহার প্রাকার ও তোরণ দৃঢ় এবং তাহাতে যদি একটি মাত্র দ্বার থাকে—তবে সেই নগর হইতে যত লোক নির্গমন করিবে তাহারা পর পর ঐ এক দ্বারপথেই যাইবে; তাহারা পরস্পর আলাপ না করিয়াও এইরূপই করিয়া থাকে। চক্ষুর্বিজ্ঞানই মনোবিজ্ঞানের দ্বার স্বরূপ বলিয়া চক্ষুবিজ্ঞানের দ্বারপথেই তাহাকে চলিতে হয়। চীর্ণত্ব-হেতুর উপমায় বলা হইয়াছে—যদি প্রথমে একখানি ও পরে আর একখানি শকট যাইতে হয় তবে দ্বিতীয়খানি যেমন কোনও আলাপ না করিয়াই প্রথমখানির অনুসরণ করে, চক্ষুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানও তাহাই করে। সমুদাচরিতত্ব হেতু অর্থাৎ বহুব্যবহার হেতুও এইরূপ চক্ষুর্বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সাহচর্য সিদ্ধ হয়। চক্ষুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা সত্য, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায় (ত্বক্) বিজ্ঞান প্রভৃতি এবং মনোবিজ্ঞানের সহচরত্ব সম্বন্ধেও সেই একই সত্য। আবার মনোবিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয় বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, বিতর্ক, বিচার প্রভৃতিও সেইখানেই উৎপন্ন হয়। একটি থাকিলেই অপরটি আসিবে।

॥ ২ ॥

'উদানে'র ভিতরকার 'বোধি-সুত্তে'র ভিতরে ভগবান্ বুদ্ধের এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ-তত্ত্ব লাভ প্রসঙ্গে বর্ণনা দেখিতে পাই, ভগবান্ বুদ্ধ নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে 'প্রথমাভিসম্বুদ্ধ' হইয়া বিহার করিতেছিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ সপ্তাহকাল একাসনে নিষণ্ণ থাকিয়া 'বিমুক্তিসুখ' অনুভব করিতেছিলেন। সেই সপ্তাহের শেষে ভগবান্ সেই সমাধি হইতে জাগ্রত হইয়া রাত্রির প্রথমযামে অনুলোমক্রমে প্রতীত্য-সমুৎপাদের তত্ত্বকে সাক্ষাৎকার

করিলেন, সেই অনুলোমক্রম হইল, 'এইটা হইলে একটা হয়, ইহার উৎপাদ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়;'—যেমন (১) অবিদ্যাপ্রত্যয় হইতে, (২) সংস্কারসমূহ, (৩) সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, (৪) বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপ, (৫) নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, (৬) ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, (৭) স্পর্শ হইতে বেদনা, (৮) বেদনা হইতে তৃষ্ণা, (৯) তৃষ্ণা হইতে উপাদান, (১০) উপাদান হইতে ভব, (১১), ভব হইতে জাতি, (১২) জাতি হইতে জরা-মরণ-শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়। রাত্রির মধ্যযামে ভগবান্ আবার এই প্রতীত্য-সমুৎপাদের তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন প্রতিলোম-ক্রমে,—অর্থাৎ 'ইহা না হইলে ইহা হয় না, ইহার নিরোধের দ্বারা ইহার নিরোধ হয়'; যেমন অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় ইত্যাদি। রাত্রির শেষযামে ভগবান্ আবার অনুলোম প্রতিলোম উভয় মিলাইয়া এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন; অর্থাৎ 'ইহা হইলে ইহা হয়, ইহা না হইলে ইহা হয় না।'

উপরে অবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া জরা-মরণ-শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য পর্যন্ত যে বারটি উৎপাদের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাই হইল বৌদ্ধশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ 'ভব-চক্র'; এই বার প্রকারের 'ভব' (ভূ ধাতু + অল্ = হওয়ার ভাব) পরস্পর পরস্পরের উপরে নির্ভর করিয়া চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এই চক্রের আরম্ভ অবিদ্যায়—ইহাই সর্বপ্রকার 'ভবে'র অনাদি মূল—এইখান হইতেই ভব-প্রবাহ প্রসৃত হয়। অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া দেখা দেয় সংস্কার, সংস্কারের পরিণতি বিজ্ঞানে বা ব্যক্তি-চৈতন্যে; বিজ্ঞান থাকিলে থাকে নাম-রূপ; নাম-রূপের মধ্যে রূপ হইল 'বাস্তব অস্তিত্ব'; রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানের মধ্যে রূপস্কন্ধ লইয়া হইল নাম-রূপের 'রূপ'; আর বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান (চেতনা) হইল 'নামে'র অন্তর্গত। নাম-রূপকে আশ্রয় করিয়াই দেখা দেয় ষড়ায়তন বা ছয়টি ইন্দ্রিয়; ছয়টি ইন্দ্রিয় থাকিলেই 'স্পর্শ' ঘটিবে; স্পর্শ হইতেই হইল 'বেদনা' (বেদনা কথার অর্থ যে-কোনও অনুভূতি, feeling) 'বেদনা'ই জন্মায় 'তৃষ্ণা'—'তৃষ্ণা' হইল 'উপাদান' বা অত্যাশক্তির আশ্রয়; উপাদান হইতেই কর্মসম্ভব 'ভব' বা অস্তিত্বাকাঙ্ক্ষা; ভব হইতে 'জাতি' বা জন্ম—জন্ম হইতেই দুঃখ। সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রথমে চাই জাতি-নিরোধ,—জাতি নিরোধ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে অবিদ্যা-নিরোধের উপরে।

॥ ৩ ॥

মহাযান দার্শনিকগণের মধ্যে নাগার্জুনের 'মাধ্যমিকবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া চন্দ্রকীর্তি যে কারিকা করিয়াছেন তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। নাগার্জুন মাধ্যমিক-বৃত্তির প্রারম্ভে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

অনিরোধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্।
অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমম্ ॥
যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবম্।
দেশয়ামাস সম্বুদ্ধস্তং বন্দে বদতাম্বরম্ ॥

এই প্রণাম-শ্লোকে প্রতীত্যসমুৎপাদের আটটি বিশেষণ দেখিতে পাইতেছি; প্রতীত্যসমুৎপাদ হইল (১) অনিরোধ, (২) অনুৎপাদ, (৩) অনুচ্ছেদ, (৪) অশাশ্বত (৫) অনেকার্থ, অথচ (৬) অনানার্থ, (৭) অনাগম, আবার (৮) অনির্গম। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে নাগার্জুনের মতে প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রতিপাদ্য হইল—শুধু যে 'উৎপাদ' মিথ্যা তাহা নহে, নিরোধও মিথ্যা,—অর্থাৎ যেখানে উৎপাদই নাই, সেখানে নিরোধ হইবে কিসের? আবার বুদ্ধের মত যে শুধু শাশ্বতবিরোধী তাহা নহে, উচ্ছেদ—অর্থাৎ সম্পূর্ণ negation-এরও বিরোধী; 'আগম'ও যেমন সত্য নহে, তেমনই আবার 'নির্গম'ও সত্য নহে; যাহা পরমার্থ সত্য তাহা এই উৎপাদ-নিরোধ, শাশ্বত-উচ্ছেদ, একার্থ-নানার্থ, আগম-নির্গম, সকলেরই অতীত—তাহা হইল 'প্রপঞ্চোপশমং শিবং'—সর্ব-প্রকার প্রপঞ্চের উপশমহেতু শিব—উহা অনির্দেশ্য—অলক্ষণ—তাহাই 'শূন্য'—সেই 'অনির্দেশ্য শূন্য'ই হইল উভয়প্রান্তের মধ্যসত্য, তাই নাগার্জুন হইলেন 'মাধ্যমিক'; এই মধ্যসত্য শূন্যতাই হইল প্রতীত্যসমুৎপাদ-বাদের মূল লক্ষ্য।

কারিকাকার চন্দ্রকীর্তি প্রথমে প্রতীত্যসমুৎপাদ কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের আলোচনা করিয়াছেন। একমতে সমুৎপাদ শব্দের অর্থ হইল প্রাদুর্ভাব; প্রতীত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি হইল, প্র+ই ধাতু+য; ই ধাতু গমনে; গতি এখানে প্রাপ্তি অর্থে; তাহা হইলে প্রতীত্য শব্দের অর্থ হইল প্রকৃষ্টরূপে পাইয়া; প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ হইল, প্রকৃষ্টরূপে পাইয়া কোনও কিছুর প্রাদুর্ভাব। অপরে বলেন, ই ধাতু এখান গমন অর্থাৎ বিনাশার্থে; প্রতি এখানে বীপ্সার্থে ব্যবহৃত; প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ তাহা হইলে হয়, 'প্রতি প্রতি ইত্যানাং বিনাশিনাং সমুৎপাদঃ'—'প্রতি প্রতি বিনাশীর প্রাদুর্ভাব'; অর্থাৎ একটা

নিরুদ্ধ হইয়া অপরটি উৎপন্ন হয় (একো নিরুজ্ঝতি অঞ্ঞো উপ্পজ্জতি)। চন্দ্রকীর্তি বলিতেছেন, প্রতীত্যসমুৎপাদের আসল তাৎপর্য এই-জাতীয় তর্কের মধ্যে পাওয়া যাইবে না; তাহার আসল তাৎপর্য হইল এই,—

ন স্বতো নাপি পরতো ন দ্বাভ্যাং নাপ্যহেতুতঃ।
উৎপন্না জাতু বিদ্যন্তে ভাবাঃ কচন কেচন ॥

'আপনা হইতে নয়—পর হইতেও নয়—উভয় হইতেও নয়—অহেতু হইতেও নয়—কোনও ভাবই কোথাও উৎপন্নরূপে বিদ্যমান নাই।' উৎপত্তি হইতে হইলে তাহার চারি রকমে সম্ভাবনা,—(১) হয় স্বতঃ, না হয় (২) পরতঃ, না হয় (৩) উভয়তঃ, অথবা (৪) অহেতুতঃ। স্বতঃ কোনও উৎপত্তিই হইতে পারে না; কারণ সেরূপ উৎপত্তি সম্ভব হইলে বলিতে হয় যে 'ক' 'ক' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে কথার অর্থ কি? 'ক' যদি 'ক' হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে সে উৎপন্ন হইল কি? 'ক' ত চিরকালই 'ক'ই আছে, 'যে 'ক'ই আছে সে আবার 'ক' হইল কথার তাৎপর্য কি? সুতরাং স্বতঃ উৎপত্তি একটা অবান্তর কথা। তাহা হইলে দ্বিতীয় সম্ভাবনা 'পরতঃ উৎপত্তি; অর্থাৎ 'অ-ক' হইতে 'ক'-এর উৎপত্তি। তাহাই বা সম্ভব কি করিয়া? যাহা 'অ-ক' তাহার মধ্যে ত সর্বপ্রকারে 'ক'-ধর্মের অসদ্ভাব। আবার যাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা 'ক'-এর মধ্যেও নাই 'অ-ক'-এর মধ্যে নাই, 'ক' এবং অ-ক' যুক্ত করিলেই বা তাহার সম্ভাবনা আসিবে কোথা হইতে? সুতরাং উভয়তঃ উৎপত্তির সম্ভাবনাও এইভাবে নিরস্ত হইয়া যায়। আর যদি বলা যায় যে অহেতুতঃ বস্তুর উৎপত্তি—তবে ত কিছু না হইতেই যে-কোনও কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে, তবে আর শূন্যতা হইতে ধর্মসমূহের উৎপত্তি বলিতেই বা আপত্তি থাকে কি?

বলা যাইতে পারে, আদৌ যদি কোনও উৎপাদের সম্ভাবনা না থাকে তবে 'প্রতীত্য' বিশেষণের সহিত যুক্ত করিয়া ভগবান্ যে 'সমুৎপাদে'র কথা বলিয়াছেন সেই সমুৎপাদেরই বা অর্থ কি? তিনি যেখানে বলিয়াছেন যে অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপ এই প্রকারের উৎপাদ হয়, অথবা তিনি যখন বলিয়াছেন যে 'এইটা হইলে এইটা হয়' তখন সেই 'হওয়া' শব্দেরই বা অর্থ কি? চন্দ্রকীর্তির মতে এই সমুৎপাদ বা 'হওয়া' হইল সম্পূর্ণ সাংবৃতিক (provisional); তাহার কোথাও পারমার্থিক সত্তা নাই। এই জন্য ভগবান্ সর্বদা 'ইদংপ্রত্যয়ে'র (ইদপ্পচ্চয়) কথা বলিয়াছেন। অবিদ্যারও সাংবৃতিক সত্তা আছে, কোনও পারমার্থিক সত্য

নাই; 'অবিদ্যা-প্রত্যয়'কে অবলম্বন করিয়া 'সংস্কার-প্রত্যয়' দেখা দেয়—এক প্রকারের প্রত্যয় হইতে আর এক প্রকারের প্রত্যয়—ইহার মধ্যে বস্তুতঃ উৎপত্তির কোনও প্রশ্ন উঠিতেছে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভবচক্র-প্রবর্তক 'অবিদ্যা'র স্বরূপ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে কিছু কিছু বিতর্ক দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন বৌদ্ধদের 'অবিদ্যা' অনেকখানি হইল সাংখ্যের 'অব্যক্তা নিত্যা প্রকৃতি'র মত। এই 'অব্যক্তা প্রকৃতি'ই যেমন সকল সংসারচক্রপ্রবর্তনের মূলে তেমনই অনাদি অবিদ্যাই হইল ভব-চক্র প্রবর্তনের মূলে। অনেক বৌদ্ধ দার্শনিক অবশ্য এই জাতীয় মতবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। চন্দ্রকীর্তি যে দৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এই জাতীয় কল্পনা সমূলেই বিনাশ হইয়া যায়,—কারণ তিনি অবিদ্যারও প্রত্যয়-রূপে একটা সাংবৃতিক সত্য ব্যতীত অপর কোনও সত্য স্বীকার করেন নাই।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত

বৌদ্ধধর্মকে সাধারণতঃ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়,—হীনযান বৌদ্ধধর্ম ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম। সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে, পালিতে লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রের মধ্যে যে বৌদ্ধধর্মের ও দর্শনের বিবরণ পাওয়া যায় তাহাই প্রাচীন মত; এই প্রাচীন মতই হইল হীনযান; সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে যে বৌদ্ধশাস্ত্র পাওয়া যায় তাহা কিঞ্চিৎ পরবর্তী—এবং তাহাই মহাযান মত। হীনযান সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশীয় জনপদে প্রচলিত বলিয়া হীনযানকে অনেক সময় দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধধর্ম এবং মহাযানের প্রাধান্য তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বলিয়া ইহাকে উত্তর দেশীয় বৌদ্ধধর্মও বলা হয়। অবশ্য প্রাচীন মত সম্পর্কে হীনযান নামটি পরবর্তী কালের মহাযানের লেখকরাই বেশি করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মহাযানী দার্শনিক অসঙ্গ তাঁহার 'মহাযান-সূত্রালঙ্কার' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

আশয়স্যোপদেশস্য প্রয়োগস্য বিরোধতঃ।
উপস্তম্ভস্য কালস্য যৎ হীনং হীনমেব তৎ॥

অর্থাৎ হীনযানের সহিত মহাযানের বিরোধ (১) আশয়—অর্থাৎ চরম আদর্শ লইয়া, (২) উপদেশ লইয়া, (৩) ধর্মের ক্ষেত্রে উপদেশের প্রয়োগ লইয়া, (৪) সাধনার অবলম্বন বা আশ্রয় লইয়া, আর (৫) সাধনকালের পরিমাণ লইয়া। এই সকল বিষয়েই প্রাচীনেরা হীন ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা হীনযানী। প্রাচীন থেরবাদীদের (স্থবিরবাদী) চরম আদর্শ ছিল শূন্যতা-জ্ঞান লাভের দ্বারা নির্বাণ অবলম্বন করিয়া আর্হত্ত্ব লাভ করা। কিন্তু মহাযানীরা বলিবেন, নিজে নির্বাণ লাভ করিয়া 'অর্হৎ' হইলে ত চলিবে না,—দুঃখ-প্রপীড়িত বিশ্বজীবের তাহা হইলে অবস্থা কি হইবে? প্রত্যেক মানুষ—প্রত্যেক জীবেরই মুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং এই জন্য আত্ম-মুক্তির প্রলোভনকে ত্যাগ করিতে হইবে, নিজে নির্বাণ লাভের উপযুক্ত হইলেও নির্বাণ ত্যাগ করিয়া মহাকরুণা অবলম্বন করিয়া এই জগতেই থাকিতে হইবে—শূন্যতায় বা প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই মহাকরুণা অবলম্বন বিশ্বজীবের মুক্তির জন্য অনন্ত কল্প

ধরিয়া কুশলকর্ম করিয়া যাইতে হইবে—ইহাই হইল মহাযানীর পথ—ইহা হইল 'অর্হত্বে'র পথ নয়—'বোধিসত্ত্বে'র পথ।

কিন্তু ইদানীং কালে পণ্ডিতগণ হীনযান ও মহাযানকে এইভাবে আর স্পষ্ট প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ও উত্তরকালীন বৌদ্ধধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন না। উভয় মতের ভিতরকার তত্ত্বগত পার্থক্যকেও এখন আর খুব স্পষ্ট বলিয়া স্বীকার করা হয় না। অনেক পণ্ডিত আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন, তথাকথিত মহাযান মতের বীজ পালিশাস্ত্রের মধ্যেই নানা ভাবে ছড়াইয়া আছে। যাহা এখানে সেখানে অস্পষ্টভাবে ছড়াইয়াছিল তাহাই মহাযানের লেখকগণের লেখায় স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

দার্শনিক মতের দিক হইতে বিচার করিয়া মহাযান সম্বন্ধে একটা কথা আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখিতে পাই, চরম সত্য ও তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে সকল আলোচনা শাস্ত্রকারগণ সযত্নে এড়াইয়া চলিয়াছেন। ইতিহাসের দিক হইতে জিনিসটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধদেব যখন ভারতবর্ষে তাঁহার মত প্রচার করিয়াছিলেন তখন তৎকালীন ভারতীয় চিন্তাধারায় তিনি কতকগুলি প্রবণতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই প্রবণতার মধ্যে প্রধান হইল একটা কার্য-কারণনিয়মে বিশ্বাস ও একটা শাশ্বতবাদে বিশ্বাস; অন্য বিশ্বাসগুলি এই দুই মৌলিক বিশ্বাসের উপরেই প্রোথিত ছিল। বুদ্ধদেব তাই প্রথম আঘাত করিলেন এই কার্য-কারণবাদ ও শাশ্বতবাদের উপরে। তিনি কার্য-কারণ-বাদকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া সেখানে স্থাপন করিলেন প্রতীত্যসমুৎপাদ-বাদ। ইহাতে তিনি আসল উৎপত্তিকেই একেবারে অস্বীকার করিলেন; বলিলেন কার্য বলিয়াও কিছু নাই, তাহার কারণ বলিয়াও কিছু নাই, আছে শুধু একটা অনাদি-অবিদ্যাজাত অস্তিত্ব-প্রবাহের ঘূর্ণাবর্ত। একটা কোনও দৃশ্য দেখিলাম, চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হইল। কি করিয়া হইল? আমরা বলি, এই চক্ষুর্বিজ্ঞান একটি 'কার্য'; ইহার 'কারণ' হইল বাহিরের রূপ সমুদয় এবং আমার দুইটি চক্ষু। বুদ্ধদেব বলিলেন, —তাহা হইলে বলা যাক্—যদি রূপ থাকে—আর চক্ষুর্দ্বয় থাকে—তবে চক্ষুর্বিজ্ঞান থাকে; কতগুলি জিনিসকে পাইলে তাহাদিগকেই হেতু-প্রত্যয় রূপে অবলম্বন করিয়া আর একটা জিনিস পাই—তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর একটা—তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর একটা—এমনিভাবে চলিতে থাকে অস্তিত্বের ব্যবহারিক প্রতীতি বা প্রতিভাস—কিন্তু উৎপত্তি নহে। এই প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বারাই যদি সর্বপ্রকারের অস্তিত্ব-প্রবাহের ব্যাখ্যা করিতে

হয় তবে ইহার ভিতরে শাশ্বততত্ত্বের প্রশ্নই ওঠে না; আর কোনও প্রকার শাশ্বততত্ত্বে যদি বিশ্বাসই না আসিল তাহা হইলে কোনও চরম বা পরমসত্তা এবং তাহার স্বরূপের কোনও প্রশ্নই আসে না। পালি শাস্ত্রের ভিতরে এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া আমরা মোটামুটিভাবে একটা নেতিমূলক দৃষ্টিরই প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে পারি।

কিন্তু মনে হয় বুদ্ধদেবের এই যে চিন্তার ক্ষেত্রে বিদ্রোহ তাহার জোর এবং প্রখরতা চিরস্থায়ী হইল না—চিরস্থায়ী হওয়াও ইতিহাসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নয়। উপনিষদের যুগ হইতে ভারতবর্ষের চিন্তাধারার মধ্যে যে একটা অদ্বয় শাশ্বতবাদের ঝোঁক আছে—চিন্তার ক্ষেত্রে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আস্তে আস্তে আবার সেই ঝোঁকেরই প্রাধান্য দেখা যাইতে লাগিল। মহাযানের প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের ভিতরে একমাত্র নাগার্জুন সম্বন্ধে অবশ্য সংশয়ের অবকাশ আছে তিনিও এই শাশ্বত অদ্বয়বাদের দিকে ঝুঁকিয়াছেন কি না; কিন্তু অশ্বঘোষের নামে যে 'মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদ' শাস্ত্র আমরা পাইতেছি তাহা জাল বলিয়া প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে তিনি যে 'তথতা'র কথা বলিয়াছেন তাহার ইঙ্গিত অদ্বয় শাশ্বতবাদের দিকে। সমস্ত পরিবর্তনশীল প্রাতিভাসিক রূপের পশ্চাতে তিনি যে 'তথতা' রূপের কথা বলিয়াছেন তাহাকেই তিনি 'শূন্যতা' রূপ বলিয়াছেন। এই 'তথতা'কে অবশ্য তিনি সৎও বলেন নাই, অসৎও বলেন নাই, সদসৎও বলেন নাই,—'তথতা' রূপকে তিনি সর্বদাই অনির্বচনীয় রূপ বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাহাকে অবিকারী, অপরিবর্তনীয়, অবিনাশীও বলিয়াছেন। এই বাক্যজালের ভিতর হইতে অবশ্য 'তথতা'র স্বরূপ বুঝিয়া লওয়া সহজ নহে; কিন্তু আমরা যে জিনিসটি ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারি তাহা হইল চিন্তাধারার মধ্যে অদ্বয় শাশ্বতবাদের দিকে একটা ঝোঁক। বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদের প্রচারক মৈত্রেয়, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রভৃতির ভিতরে যে এই প্রবণতা ছিল তাহাতে আমাদের কোনও সংশয় নাই। বিজ্ঞানবাদীরা নেতি মার্গে যত কথাই বলুন না কেন, বিজ্ঞানের পশ্চাতে আবার তাহার শাশ্বত আশ্রয় রূপে যখন আবার আলয়-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে হইল তখন অদ্বয় শাশ্বতবাদের প্রবণতাকে আর অস্বীকার করিতে পারি না।

অবশ্য এই অদ্বয় শাশ্বতবাদের প্রবণতা দেখিয়াই অমনি বিজ্ঞানবাদিগণের 'তথতা'কে বা 'বিজ্ঞান'কে বা 'অভূতপরিকল্প'কে উপনিষদের ব্রহ্ম বা বেদান্তের ব্রহ্মের সঙ্গে এক করিয়া দেখা উচিত হইবে না। আমাদের ভারতীয় মন ব্রহ্ম-

বাদী বলিয়া আমরা কোথাও কোনও প্রকার 'এক' পাইলেই অমনি সেখানে 'ব্রহ্মে'র প্রতিষ্ঠা করিয়া লই। বেদান্তের 'ব্রহ্মে'র সহিত 'তথতা' বা 'বিজ্ঞানে'র মূল পার্থক্য হইল এইখানে যে ব্রহ্ম পুরুষ, কিন্তু 'তথতা' বা 'বিজ্ঞান' কখনও পুরুষ নয়। কিন্তু দার্শনিক চিন্তার ঐতিহাসিক ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, এই বিজ্ঞানবাদের 'তথতা' বা 'বিজ্ঞান'কে অবলম্বন করিয়াই ঔপনিষদিক ব্রহ্মের দার্শনিক বেদান্তে নব প্রতিষ্ঠা। বেদান্তের ব্রহ্মের এই নব-প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তার ভিতরকার যুগ যুগ সঞ্চিত অনেক জঞ্জাল সরাইয়া নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রয়োজন ছিল; মহাযানী দার্শনিকগণ চিন্তার ভিতরকার এই জঞ্জাল দূর করিবার দিকেই দৃষ্টি বেশি দিয়াছিলেন। পুরাতন গাথুনিকে ভাঙ্গিবার এবং ভাঙ্গিয়া জঞ্জাল দূর করিবার জন্য 'শূন্যতা'কেই মহাযানী দার্শনিকগণ প্রধান অস্ত্র এবং পরিষ্কারক যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন; মনে হয়, সেই পরিষ্কার ভূমিতে আচার্য শঙ্কর আসিয়া তাঁহার ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে দেখিতে পাই, আচার্য শঙ্করকে প্রায় সর্বত্রই 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' এবং নাস্তিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কথাটি যে কেবল শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবদের উষ্মা প্রকাশ মাত্র তাহা নহে, কথাটির ভিতরে একটি ঐতিহাসিক সত্যও প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া মনে হয়। শঙ্কর ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মায়াবাদের উপরে। এই মায়াবাদের আলোচনা আমরা মহাযানী বৌদ্ধ দার্শনিকগণের আলোচনায় বিশেষভাবে দেখিতে পাই। মহাযানিগণের ভিতরে নাগার্জুনের মাধ্যমিকবাদে এবং মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদে এই মায়াবাদের বিস্তৃত এবং সূক্ষ্ম আলোচনা রহিয়াছে। মাধ্যমিকগণের বা বিজ্ঞান-বাদিগণের মায়াবাদ এবং শঙ্করের মায়াবাদ সর্বাংশে এক নহে; শঙ্কর নিজে ইঁহাদের মায়াবাদের অনেক স্থলে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন; কিন্তু আমরা মোটামুটি ভাবে দেখিতে পাই, পূর্ববর্তী বৌদ্ধগণ তাঁহাদের মায়াবাদের দ্বারা জাগতিক সর্বপ্রকার অস্তিত্বকে নিরস্ত করিয়াছেন; শঙ্করও একটু ভিন্ন ভাবে সেই পথেই অগ্রসর হইয়াছেন। মনে হয়, একটা বিশেষ ধরনের চিন্তাধারাকে বৌদ্ধেরা যেখানে আনিয়া দিয়াছিলেন শঙ্করও সেখান হইতে সেই 'শূন্যতা'র ধারাটিকেই আগাইয়া আনিয়া তাহাতে এক প্রকারের একটা পূর্ণতা দান করিয়াছিলেন।

নাগার্জুন তাঁহার মাধ্যমিক-বৃত্তির প্রারম্ভেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি কোনও বিশেষ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তি-বিচারের অবতারণা করিতেছেন না;—তাঁহার উদ্দেশ্য পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে কোনও

বিশেষ মতবাদ স্থাপন নহে,—তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে যিনিই যে মতবাদের অবতারণা করিবেন তাহাই খণ্ডন করা। সুতরাং দেখিতেছি, পরমার্থ সত্য সম্বন্ধে সকল রকম শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করাই নাগার্জুনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সব সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিলে যাহা গিয়া দাঁড়ায় তাহাই হইল নাগার্জুনের 'শূন্যবাদ'; 'শূন্যবাদে'র দ্বারা কোনও নূতন সিদ্ধান্তের স্থাপন বুঝাইতেছে না। বিজ্ঞানবাদীরা অবশ্য নাগার্জুনের ন্যায় এতখানি ধ্বংসবাদী এবং নেতি-বাদী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের আস্তিক্য মতও খুব দৃঢ় এবং স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহারাও কাছে আসিয়া আসিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছেন। মোটের উপরে মনে হয়, বৌদ্ধেরা তর্কের জালই বিস্তার করিয়াছেন বেশি,—সে তর্কের সিদ্ধান্তে কোনও 'একে'র প্রতিষ্ঠার উপরে জোর পড়ে নাই; আচার্য শঙ্কর এই সকল যুক্তির সিদ্ধান্ত স্বরূপেই তাঁহার অদ্বৈত ব্রহ্মবাদকে স্থাপন করিয়াছেন।

মাধ্যমিক-মতবাদের প্রবর্তক নাগার্জুনের মতবাদ যে স্পষ্ট কি ছিল, তাহা বুঝিয়া ওঠা শক্ত। তাঁহার মতবাদকে সমালোচনা করিতে গিয়া প্রতিপক্ষ বিজ্ঞানবাদ এবং বেদান্ত সকল সময়েই তাঁহাকে 'বৈনাশিক' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু নাগার্জুনকে এইভাবে সর্বদাই 'বৈনাশিক' আখ্যায় অভিহিত করিয়া বিজ্ঞানবাদ এবং বেদান্ত তাঁহার মতবাদের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করিয়াছেন কিনা এ বিষয়ে এখন পণ্ডিত মহলে সংশয় দেখা দিয়াছে। তাঁহারা বলেন, নাগার্জুনের 'শূন্যতা'কে এইভাবে একেবারে নাস্তিক্য-বাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার যথেষ্ট যৌক্তিকতা নাই। এই 'শূন্যতা'কে একেবারে অনস্তিত্ব বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, ইহাকে যদি বাক্য-মনের অগোচর পরমার্থ সত্যের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, নাগার্জুনের এই 'শূন্যতা'-বাদ পূর্ববর্তী উপনিষদ্ ধর্মের দ্বারাই প্রভাবান্বিত এবং বেদান্তের অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদেরই পূর্বাভাস মাত্র।

সমস্ত বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করিলে মোটের উপরে মনে হয় যে, পরমার্থ সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের যে মতবাদ তাহা কোনও স্পষ্ট অনস্তিত্ববাদ নহে, বুদ্ধদেবের সাধারণ নিয়ম ছিল এই যে, এই জাতীয় প্রশ্নের তিনি কোনও স্পষ্ট জবাব দিতেন না—এ বিষয়ে গভীর নীরবতাই তাঁহার উপদেশাবলীর বৈশিষ্ট্য। 'ভগবান' আছেন কি নাই এ বিষয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'হাঁ' কি 'না' এই স্পষ্ট জবাব পাইবার চেষ্টাও একাধিকবার করা হইয়াছে; কিন্তু তিনি এ বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির ভিতরে কখনও

আসিতে চাহেন নাই। ভারতীয় চিন্তাধারার ভিতরে পরম সত্য-স্বরূপ সম্বন্ধে যে এই গভীর নীরবতা, ইহা একটা নূতন জিনিস নহে; বরঞ্চ এই কথাই বলা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, পরম সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে এই জাতীয় নীরবতাই আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। উপনিষদের ভিতরেও সর্বদা বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের স্বরূপ বাক্যমনের অগোচর। কেনোপনিষদের ভিতরে দেখিতে পাই,—

> ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো।
> ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদ্ অনুশিষ্যাৎ ॥
> অন্যদ্ এব তদ্ বিদিতাদ্ অথো অবিদিতাদ্ অধি।
> ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে ন স্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥
> যদ্ বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগ্ অভ্যুদ্যতে।
> তদ্ এব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদ্ ইদম্ উপাসতে ॥
> যন্ মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
> তদ্ এব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদ্ ইদম্ উপাসতে ॥ (কেন, ১ম, ৩-৪)

অর্থাৎ—"সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মনও যায় না; আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানি না, এবং ইহাও জানি না যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত ও অবিদিত সকল বস্তু হইতেই পৃথক্। যে সকল পূর্বাচার্যগণ আমাদের নিকটে ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে আমরা এইরূপই শুনিয়াছি। যাঁহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—যাঁহা কর্তৃক বাক্য প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে—লোকে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন। মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; লোকে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।" শঙ্করাচার্যও সর্বদাই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-জ্ঞানের ভিতরে কোনও জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাতা নাই, জ্ঞান নাই। ইউরোপীয় সংশয়বাদী এবং তথাকথিত নাস্তিকবাদী দার্শনিকগণও পরম সত্য সম্বন্ধে অনেক সময় এইরূপ নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। বৌদ্ধদের ভিতরেও এই নীতিই গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধ সূত্র গ্রন্থে আমরা পরমার্থ সত্য সম্বন্ধে এই নীরব রীতিই দেখিতে পাই,—নাগার্জুনের 'শূন্যতা'ও সেই নীরব রীতিরই রূপান্তর। বস্তুর যাহা পরমার্থ সত্তা তাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না, তদুভয়ও বলা যায় না, তদুভয় না এমনও বলা যায় না, শূন্যতা অর্থ এই চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ততা।

মাধ্যমিক বৃত্তির 'নির্বাণ-পরীক্ষা' প্রকরণে দেখিতে পাই, নাগার্জুন ধর্ম (বস্তু) সকলের পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

আবাচ্যনক্ষরাঃ সর্বশূন্যাঃ শান্ত্যাদিনির্মলাঃ।

—অর্থাৎ ধর্ম সকলের পারমার্থিক সত্তা বাক্যের অতীত, পরিবর্তনহীন, সর্বশূন্য এবং স্বরূপতঃ শান্ত এবং নির্মল। ধর্মসমূহের এই যে পারমার্থিক সত্তা, ইহাই চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত শূন্যতা-রূপ। অন্যত্রও নাগার্জুন বলিয়াছেন যে, ধর্মসমূহের পারমার্থিক সত্তা শূন্যও নয় অশূন্যও নয়, তথাপি সেই শূন্যাশূন্য-রূপকে কোনও-রূপে ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইবার জন্যই তাহাকে শূন্যতা আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং নাগার্জুন নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে ধর্মের শূন্যতা অর্থে তিনি ধর্মের বাক্যমনের অতীত সত্তাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, নাগার্জুনের মতবাদ অস্তিত্ববাদী কিনা এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে; কিন্তু অশ্বঘোষ প্রচারিত 'তথতা'বাদ এবং মৈত্রেয়, অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু প্রচারিত বিজ্ঞানবাদ বা 'অভূতপরিকল্প'বাদ যে মূলতঃ অস্তিত্ববাদী, ইহাতে আর সংশয় নাই। অশ্বঘোষ ধর্মসমূহের 'তথতা' রূপকেই তাহার পরমার্থ-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই 'তথতা' রূপকে তিনি অক্ষর, শাশ্বত, পরমার্থসৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য অশ্বঘোষও তাঁহার 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদ' গ্রন্থে এই 'তথতা' স্বরূপকে অস্তি, নাস্তি, তদুভয় এবং তদুভয়ের অভাব হইতে ঊর্ধ্বে রাখিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি ধর্মের শাশ্বত 'তথতা' সত্তাকে স্বীকার করিয়াছেন। মৈত্রেয়-বিবৃত এবং বসুবন্ধু দ্বারা ব্যাখ্যাত 'মধ্যান্তবিভাগ-টীকা' গ্রন্থে দেখিতে পাই,—

অভূতপরিকল্পোঽস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে।
শূন্যতা বিদ্যতে ত্বত্র তস্যামপি স বিদ্যতে॥

'অভূতপরিকল্প' সকল ধর্মের বীজভূত, ইহা হইতেই গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ 'দ্বয়ে'র উৎপত্তি হয়, কিন্তু ধর্মের 'অভূতপরিকল্প' রূপের ভিতরে কোনও দ্বৈততা নাই, ইহা ধর্মসমূহের অদ্বয় রূপ। এই যে গ্রাহ্যগ্রাহক-রহিত ধর্ম-সমূহের অভূতপরিকল্প রূপ, ইহাতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরহিত অদ্বৈত ব্রহ্মের ইঙ্গিত আছে। বিজ্ঞানবাদিগণ সর্বদাই ধর্মের এই গ্রাহ্য-গ্রাহক রূপকে অস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এই গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিত যে বিজ্ঞান-ধাতু তাহাকেই তাঁহারা পরমার্থ সৎ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'মধ্যান্তবিভাগ-টীকা'য় দেখিতে পাই— 'অভূতপরিকল্প' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, 'অভূতবচনেন চ যথায়ং পরিকল্প্যতে গ্রাহ্যগ্রাহকত্বেন তথা নাস্তীতি প্রদর্শয়তি। পরিকল্প-বচনেন স্বর্থো

যথা পরিকল্প্যতে তথার্থো ন বিদ্যতে ইতি প্রদর্শয়তি।' অর্থাৎ 'অভূত' শব্দের তাৎপর্য এই যে আমরা ধর্মসমূহকে যে ভাবে গ্রাহ্যগ্রাহকরূপে কল্পনা করি, বস্তুসকল পরামার্থতঃ সেরূপে নাই, আর 'পরিকল্প' শব্দের তাৎপর্য এই যে, বস্তুসকলের আমরা যে ভাবে অর্থ-পরিকল্পনা করি, সেরূপ অর্থ নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা বস্তুর যে সেই কল্পিতার্থের উর্ধ্বে গ্রাহ্য-গ্রাহক-রূপ-বর্জিত একটি স্বরূপ রহিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করা হয় নাই। বিজ্ঞানবাদে 'শূন্যতা'কে কোথাও বস্তুর নাস্তিত্ব-বোধক বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই, শূন্যতা শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'গ্রাহ্য-গ্রাহক-রহিততা'। সুতরাং ধর্মের যে এই গ্রাহ্য-গ্রাহক-রহিত রূপ, ইহাই বস্তুর শূন্যতা-রূপ,—ইহাই তাহার অক্ষর শাশ্বত পরমার্থসত্তা। এই গ্রাহ্য-গ্রাহক রূপ ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণই আমাদিগকে ধর্মের শাশ্বত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বাধা দিতেছে।

ধর্মের এই যে অভূতপরিকল্প রূপ, ইহাই বিজ্ঞান-ধাতু বা 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা'। এই 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা'র স্বরূপ কি? বসুবন্ধুর 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা-সিদ্ধি' গ্রন্থে বলা হইয়াছে,—

> অচিত্তোঽনুপলম্ভোঽসৌ জ্ঞানং লোকোত্তরঞ্চ তৎ।
> আশ্রয়স্য পরাবৃত্তি র্দ্বিধা দৌষ্ঠুল্যহানিতঃ॥
> স এবানাস্রবো ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো ধ্রুবঃ।
> সুখো বিমুক্তিকায়োঽসৌ ধর্মাখ্যোঽয়ং মহামুনেঃ॥ (২৯—৩০)

—এখানে দেখিতে পাইতেছি, এই বিজ্ঞান-রূপই অচিন্ত্য অনাস্রব ধাতু, ইহা ধ্রুব এবং মঙ্গলস্বরূপ—ইহা সুখস্বরূপ—ইহাই বিমুক্তি-কায়। এই জাতীয় বিজ্ঞান-ধাতুকে একেবারে শূন্য বা nihil বলিবার কোনই কারণ নাই; বরঞ্চ আমরা ইহাকে বেদান্তের নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত এক না হইলেও কাছাকাছি করিয়া ধরিতে পারি।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আমরা বুদ্ধের ত্রিকায়ের পরিকল্পনা দেখিতে পাই; পরবর্তী কালের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে ত্রিকায়ের স্থলে চারিটি কায়ের কল্পনা দেখি। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর তাঁহার জীবনের অলৌকিক মহিমা সকল সম্প্রদায়ের বুদ্ধ-উপাসকগণের মনেই স্বাভাবিক ভাবে অসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহারা বুদ্ধদেবের অস্তিত্বকে একটা পঞ্চভৌতিক মানুষী অস্তিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে প্রস্তুত হইলেন না। বৌদ্ধগণের মধ্যে এই ভাবে আস্তে আস্তে বুদ্ধদেবের 'কায়' সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসা ও চিন্তা দেখা দিল। পালি-সাহিত্যের ভিতরে দেখিতে পাই, আস্তে আস্তে এই একটা

বিশ্বাস গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল যে বুদ্ধদেবের অস্তিত্বের দুইটি দিক্ ছিল ; একদিক্ দিয়া তিনি শাক্যসিংহ রূপে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা সত্য ; তাঁহার এই মানুষী কায়কে নাম দেওয়া হইল 'রূপ-কায়'। আবার তাঁহার অস্তিত্বের সমগ্র সত্তা শুধু তাঁহার মানুষী কায়ের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না—সেই মানুষী কায় ছিল তাঁহার একটা তত্ত্বময় অস্তিত্বেরই বিগ্রহমাত্র ; সেই তত্ত্বময় অস্তিত্বকেই বলা হইল বুদ্ধের 'অরূপ-কায়'।

মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে আসিয়া দেখি, এই 'রূপ-কায়' এবং 'অরূপ-কায়'কে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধদেবের তিনটি কায়ের পরিকল্পনা হইয়াছে ; এই তিনটি কায় হইল যথাক্রমে নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও ধর্মকায়। তান্ত্রিকবৌদ্ধেরা এই ত্রিকায়ের সহিত যোগ করিয়া দিলেন 'বজ্রকায়' বা 'সহজকায়'। নির্মাণকায় হইল মানুষী বুদ্ধ,—রক্তমাংসের দেহে আবির্ভূত। সম্ভোগকায় হইল বুদ্ধের একটা জ্যোতির্ময় আনন্দময় দেহ—যে দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি সব-জাতীয় ভক্ত উপাসকগণের নিকটে দেশনা দান করিয়াছেন। বুদ্ধের এই জ্যোতির্ময় এবং আনন্দময় দেহ হইতেই অসংখ্য বোধিসত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে—সেই বোধিসত্ত্বগণও দেশে দেশে কালে কালে সেই একই দেশনা প্রচার করিয়াছেন। এই বোধিসত্ত্বগণের কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব নাই—তাঁহারা বুদ্ধের সম্ভোগকায়েরই বিশেষ বিশেষ স্ফুরণ। ধর্মকায় বুদ্ধ হইল সর্ব-অস্তিত্বের অদ্বয় রূপ,—এক অখণ্ড মহাতত্ত্বরূপ। 'অবতংসক-সূত্রে' এই ধর্মকায় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—এই ধর্মকায় ত্রিলোকে নিজেকে মূর্ত করে, কিন্তু ইহার মধ্যে কোনও জ্ঞেয়াবরণ ক্লেশবরণ নাই। ইহা এখানে সেখানে—সর্বত্রই নিজেক প্রকাশ করে। ইহা কোনও ব্যক্তিসত্তা নয়—আবার ইহা একটা মিথ্যা সত্তাও নয়,—ইহা বিশ্বব্যাপী এবং বিশুদ্ধ। ইহা কোথাও হইতে আসে না—কোথাও যায় না ; ইহা নিজেকে জাহিরও করিতে চায় না—আবার কখনও বিনষ্টও হয় না। ইহা শাশ্বত এবং চিরশান্ত। ইহা এক—সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত।...বিশ্বের এমন কোথাও কিছু নাই যাহা এই ধর্মকায়ের বাহিরে। বিশ্ব পরিবর্তনশীল—কিন্তু ধর্মকায় নিত্য অবিনাশী। বুদ্ধের ধর্মকায় সম্বন্ধে এই জাতীয় বর্ণনা পড়িলে বেশ বোঝা যায় ইহা ঔপনিষদিক চিন্তাধারা এবং বর্ণনার দ্বারা প্রভাবিত। বস্তুতঃ মহাযান বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং সাহিত্যে এই ধর্মকায় বুদ্ধকে অনেক সময়েই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সহজেই ব্রহ্ম করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহারই পরিণতি দেখিতে পাই পরবর্তী কালের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে—যেখানে এই ধর্মকায় বুদ্ধের ধারণা হইতে আদিবুদ্ধ, বজ্রসত্ত্ব প্রভৃতির ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে।

মারবিজয়ী বুদ্ধ

বুদ্ধদেব যে 'ভগবান্' তাহা শুধুমাত্র অলৌকিক অর্থে নয়; যাঁহারা অলৌকিকতায় বিশ্বাসী নন তাঁহারাও তাঁহার ভগবত্তায় বিশ্বাসী। এই ভগবত্তা তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার বীর্যের মহিমায়, তাঁহার অটল অচল চরিত্রমহিমায়। চরিত্রের এই বজ্রকঠোর দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার কঠোর ধ্যানচর্যার ভিতরে—ধ্যানচর্যা তাঁহাকে অধিকারী করিয়া তুলিয়াছিল সম্যক্ সম্বোধির। তাঁহার এই ধ্যানের কালে 'মারে'র প্রলোভন বৌদ্ধ-সাহিত্যে অতি প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ-সাহিত্যে বর্ণিত এই মার কিন্তু ঠিক্ ঠিক্ হিন্দু সাহিত্য-পুরাণে বর্ণিত 'কাম' বা 'মদন' নহে। অবশ্য মূলতঃ মার 'কাম'ই—কারণ কাম হইতেই মানুষের সর্বপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তি ও দুষ্কর্ম,—এই জন্যই 'কামকে'ই বৌদ্ধ-সাহিত্যেও মারের প্রথম সেনা বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ-সাহিত্যে 'মার' একটি ব্যাপক অর্থ লাভ করিয়াছিল; মার হইল 'পাপিমা'—সে হইল কণ্হ (কৃষ্ণ)—অর্থাৎ জীবনে যাহা কিছু 'কালো' তাহারই মূর্ত প্রতীক। এই মারের বহু সেনা—তাহার ভিতরে প্রধান হইল 'কাম' (কামা তে পঠমা সেনা),—এই কামের দ্বারাই অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তিচয় প্রেরিত এবং পরিচালিত। বৌদ্ধধর্মে বর্ণিত এই মারের ধারণা অনেকখানি হইল খ্রীষ্টধর্মে বর্ণিত 'শয়তানের অনুরূপ; জীবনের যাহা কিছু দুষ্প্রবৃত্তি, দুর্বুদ্ধি, দুষ্কর্ম, প্রলোভন প্রভৃতি—ইহার সকলের মূলেই 'মার'। বুদ্ধদেব যখন আবির্ভূত হইলেন মানুষের মধ্যে যাহা কিছু পবিত্র ও শুভ উপাদান তাহার প্রতীকরূপে তখন তাঁহার ধ্যান-তপস্যায় সর্বদাই বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে মার, তাহার সর্বদাই ছিল মুখে মধু—বুকে বিষ। পালি 'মহাবগ্‌গে'র অন্তর্গত 'সুত্তনিপাতে'র 'পধান-সুত্তে'র ভিতরে পাপী মারের বুদ্ধদেবকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা এবং অটল-সঙ্কল্প বুদ্ধদেবের মারকে পরাজিত করিবার চমৎকার একটি দৃশ্য বর্ণিত দেখিতে পাই।

নিরঞ্জনা নদীর তীরে ধ্যানসমাহিত হইয়া আছেন সত্যার্থী গৌতম—যোগক্ষেমের প্রাপ্তির জন্য তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প। এই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া তাঁহার যে

ধ্যান সে অতি কঠোর ধ্যান, এক আসনে তাঁহার দেহ অস্থিপঞ্জরসার হইয়া গিয়াছে, তথাপি সে ধ্যানের বিরাম নাই—শিথিলতা নাই। গৌতমকে এইরূপ ধ্যানসমাহিত দেখিয়া মার আসিয়া উপস্থিত হইল তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে, মুখে তাহার করুণ মধুর বাক্য—যেন গৌতমের তপঃকষ্টে সে আপনিই ক্লিষ্ট। মার আসিয়া গৌতমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"তুমি ত কৃশ হইয়া গিয়াছ, তুমি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছ; অতি নিকটেই তোমার মৃত্যু। তোমার ভিতরে সহস্র ভাগই যে মৃত্যুর—একাংশে আছে তোমার জীবন। ইহাতে লাভ কি? তুমি বাঁচিয়া থাক, বাঁচিয়া থাকাই ত শ্রেয়ঃ,—বাঁচিয়া থাকিয়াই তুমি অশেষ পুণ্য লাভ করিতে পার। তুমি বাঁচিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিতে পার, যাগ-যজ্ঞাদি করিতে পার, এবং সেই সকলের দ্বারাই ত তুমি প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পার,—এত তপস্যার কি প্রয়োজন? দুর্গম পথ হইল এই ধ্যানের পথ—দুষ্কর হইল ইহার সকল অনুষ্ঠান।" এই জাতীয় বহু শ্রুতিমধুর কথা বলিয়া মার আসিয়া বুদ্ধের নিকটে দাঁড়াইল।

ভগবান্ বুদ্ধ চোখ তুলিয়া আস্তে আস্তে মারকে বলিলেন,—"তুমি ত কখনও আমার বন্ধু নও—তুমি হইলে প্রমত্তবন্ধু, তুমি সাক্ষাৎ পাপ—নিজের স্বার্থের জন্যই তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ। তুমি ত অনেক পুণ্যের কথা বলিলে; কিন্তু আমার যে অণুমাত্র পুণ্যেরও প্রয়োজন নাই! যাহাদের পুণ্যের প্রয়োজন তুমি তাহাদের কাছেই যাও—এবং তাহাদিগকে গিয়াই তোমার মধুর উপদেশাবলী পরিবেশন কর। আমার আছে শ্রদ্ধা—আছে বীর্য—আর আছে প্রজ্ঞা; আর কিছুর ত আমার প্রয়োজন নাই; সুতরাং এইরূপ ধ্যানসমাহিত আমাকে আর তুমি বাঁচিয়া থাকিবার লোভ দেখাইতেছ কেন?"

বুদ্ধদেব তাঁহার দেহের ক্ষীণতা এবং শুষ্কতার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, উহা ত তিনি নিজেই চাহিয়াছিলেন; কারণ মেদপুষ্ট কফাক্রান্ত দেহ লইয়া কখনও ধ্যান-ধারণা করা যায় না। বাতাস যেমন করিয়া নদীর স্রোত হইতে জল শুষিয়া লয়, ধ্যানযোগও তেমনই দেহের ভিতর হইতে রক্ত, পিত্ত, কফ প্রভৃতি শুষ্ক করিয়া লয়; দেহের মেদ কমিয়া দেহ যখন ক্ষীণ এবং বিশুদ্ধ হয় তখনই সাধকগণের চিত্ত আরও প্রসাদ লাভ করে (মংসেসু খীয়মানেসু ভিয্যো চিত্তং পসীদতি), এবং এইরূপ সাধকেরই স্মৃতি, প্রজ্ঞা, সমাধি প্রভৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং গৌতম বলিলেন যে, এইরূপে 'উত্তম বেদনা' (শ্রেষ্ঠ অনুভূতিসকল) লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প তাঁহার মন আর কামের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে না। জীবসকল স্বভাবে আসলে সকলেই শুদ্ধ;

এইরূপ ধ্যানসমাহিত নির্বিকল্পচিত্তেই জীবের এই স্বভাব-বিশুদ্ধিকে উপলব্ধি করিতে হয়।

বুদ্ধদেব বলিলেন, এই যে মারের অনেক সেনা, কামই হইল তাহার মধ্যে প্রথম। অরতি, ক্ষুৎপিপাসা, তৃষ্ণা, ভীরুতা, বিচিকিৎসা প্রভৃতি সকলই হইল কামের সেনা। যাহারা লোভী, মিথ্যালব্ধ যশে যাহাদের আকাঙ্ক্ষা—যাহারা নিজেদের সর্বদাই অপর অপেক্ষা বড় করিয়া দেখে—অপরকে নিজ অপেক্ষা হীন করিয়া দেখে—ইহারা সকলেই হইল মারের সেনা। যাহারা অশূর তাহারা মারের এই সেনাকে জয় করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা ধীর তাঁহারাই জয় করিতে পারেন এই কৃষ্ণ মারের সকল সেনা,—এবং তাঁহারা 'জেত্বা চ লভতে সুখং'—জয় করিয়া সুখ লাভ করেন। তাই ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন, মারের এইরূপ অধীন হইয়া যে জীবনযাপন—তাহাতে ধিক্—'সংগামে মে মতং সেয্যো যঞ্চ জীবে পরাজিতো'—'পরাজিত হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ'। বিষয়ে আসক্ত যত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তাহারা ধ্রুবপথের সন্ধান কখনই পায় না, যেপথে যান সুব্রতেরা সে পথের সন্ধান জানে না এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা। ধ্রুবপথের সন্ধান পাইয়াছেন গৌতম বুদ্ধ—নির্ভীক তাঁহার চিত্ত,—তাই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করিলেন,—

সমন্তা ধজিনিং দিস্বা যুত্তং মারং সবাহনং।
যুদ্ধায় পচ্চুগচ্ছামি মা মং ঠানা অচাবয়ি॥

"স্ববাহনে অধিষ্ঠিত মার এবং তাহার সঙ্গে চারিদিকে তাহার পতাকাধারী সব সৈন্য-সামন্ত দেখিয়া যুদ্ধের জন্যই আমি সম্মুখে অগ্রসর হইব, কেহ আমাকে স্বস্থান হইতে এতটুকুও নড়াইতে পারিবে না।" নির্ভীক সাধক আরও বলিলেন যে, মারের যে সৈন্যদলকে নরে দেবে মিলিয়া পরাস্ত করিতে পারে না সেই সৈন্যব্যূহকে তিনি তাঁহার প্রজ্ঞার দ্বারা অক্লেশে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন—কেহ যেমন ভাঙ্গিয়া ফেলে পাথরের দ্বারা মৃৎপাত্রকে। শুধু তাহাই নয়—

বসিং করিত্বা সংকপ্পং সতিঞ্চ সুপ্পতিট্ঠিতং।
রট্ঠারট্ঠং বিচরিস্সং সাবকে বিনয়ং পুথু॥

"সঙ্কল্পকে বশ করিয়া স্মৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশে দেশে আমি ঘুরিয়া বেড়াইব—বহু শ্রাবককে এই ধর্মপথে আনয়ন করিয়া।" এই সমস্ত বুদ্ধশিষ্যগণ হইবেন অপ্রমত্ত, সমাহিত-চিত্ত এবং বুদ্ধেরই শাসনাধীন; কামের কোনও প্রভাব থাকিবে না তাঁহাদের উপরে; এমন ধামে গমন করিবেন তাঁহারা—যেখানে গেলে আর শোক করিতে হয় না।

এইবারে মার বুঝিতে পারিল, ত্রিভুবনে আজ সে এমন প্রজ্ঞাবান্ এবং বীর্যশালী মহাপুরুষের সম্মুখস্থ হইয়াছে যেখানে তাহার সকল শক্তিই নিরস্ত। আর এই একদিনের জন্য আসে নাই মার বুদ্ধদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে, দীর্ঘ সপ্ত বৎসর এই দুরাত্মা মার ঘুরিয়াছে ভগবান্ বুদ্ধের পায়ে পায়ে; কিন্তু একটি দিনের জন্য—একটি মুহূর্তের জন্যও পায় নাই এই স্মৃতিমান্ সম্বুদ্ধের এতটুকু স্খলন; সুতরাং আজ সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, এখানে আর নাই কোনও লাভের প্রত্যাশা—তাই চলিল পরাজয়ের লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া ফিরিয়া। যেমন একটি কাক দূর হইতে একটি শ্বেতপ্রস্তর খণ্ডকে একটি বিশিষ্ট নরম স্বচ্ছ আহার্য মনে করিয়া লোভে তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, কিন্তু তাহার পর যখন বুঝিতে পারে যে ইহা কোনও নরম সুস্বাদু বস্তু নয়—ইহা কঠিন প্রস্তর, তখন সে নিরাশ হইয়া উড়িয়া চলিয়া যায়। মারেরও ঠিক সেই একই দশা ঘটিল। দূর হইতে সে বুদ্ধ ভগবানের শুভ্র কোমল রূপটি দেখিয়াই মনে করিয়াছিল—বেশ নরম মানুষ—সহজেই শিকার করা যাইবে। কিন্তু এই শুভ্র কোমল দেহটির ভিতরে যে প্রস্তর সদৃশ দৃঢ় মনটি রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাইয়া মার বুদ্ধ ভগবানের নিকট হইতে বহু দূরে চলিয়া গেল। মারের নিজের ভাষায়ই বলিতে গেলে—

সত্ত বস্সানি ভগবন্তং অনুবন্ধিং পদা পদম্।
ওতারং নাধিগচ্ছিস্সং সম্বুদ্ধস্স সতীমতো॥
মেধবণ্ণং ব পাসাণং বায়সো অনুপরিযগা।
অপে'থ মুদুং বিন্দেম অপি অস্সাদনা সিয়া॥
অলদ্ধা তথ অস্সাদং বায়সেত্তো অপক্কমি।
কাকো ব সেলং আসজ্জ নিব্বিজ্জাপেম গোতমং॥

ভগবান্ বুদ্ধের এই মানুষী চরিত্রের দৃঢ়তার কথা স্মরণ করিয়াও বলিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার 'বজ্রসত্ত্ব' নাম সব দিক হইতেই সার্থক।

অন্যান্য পালিগ্রন্থেও দেখিতে পাই, বুদ্ধদেবের দেশনার ভিতরে বহু প্রসঙ্গে এই মারের প্রসঙ্গ দেখা দিয়াছে। 'ধম্মপদে' বলা হইয়াছে,—যে লোক দেহ-শোভাকেই দর্শন করে, ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, যে অলস এবং হীনবীর্য—তাহাকে মার অভিভূত করে—যেমন অভিভূত করে বাতাস দুর্বল বৃক্ষকে। আর—

অসুভানুপস্সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু সুসংবুতং।

ভোজনম্হি চ মত্তঞ্ঞুং সদ্ধং আরদ্ধবীরিয়ং।
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলং'ব পব্বতং॥

যমকবগ্গো, ৮

যে দেহশোভায় অনুরক্ত নয়, ইন্দ্রিয়সমূহে সুসংযত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, শ্রদ্ধা-যুক্ত, আরব্ধবীর্য—তাহাকে মার অভিভূত করে না—যেমন বাতাস অভিভূত করিতে পারে না শিলাময় পর্বতকে।

'ধম্মপদে'র চিত্তবগ্গে বলা হইয়াছে,—স্পন্দনশীল, চপল, দুররক্ষণীয় এবং দুর্নিবার্য চিত্তকে মেধাবী লোক তেমন করিয়া সোজা করেন যেমন সোজা করে শরনির্মাতা তীরের ফলাকে। চিত্ত যখন সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য এবং বক্রতা, পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ একলক্ষ্য হয় তখন আর মাররাজ্যকে এই চিত্ত কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না, জলাশয় হইতে স্থলে ক্ষিপ্ত মৎস্য যেমন পুনরায় জলে যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, এই জাতীয় চিত্তও তেমনই মাররাজ্য ছাড়িবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে।

বারিজো'ব থলে খিত্তো ওকমোকত উব্ভতো।
পরিফন্দতি'দং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে॥ (৩৪)

এই মারের বন্ধন হইতে মুক্ত হন তাঁহারাই যাঁহারা দূরগামী, একচর, অশরীর, গুহাশ্রিত চিত্তকে সংযমন করিতে পারেন (চিত্তবগ্গ, ৩৭),—মার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে তাঁহারা যাঁহারা অবলম্বন করিবেন বুদ্ধ-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ।[1] 'ধম্মপদে'র 'মগ্গবগ্গে' বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—'মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সত্যের মধ্যে চতুরার্যসত্য, ধর্মের মধ্যে বিরাগ, দ্বিপদগণের মধ্যে চক্ষুমান্‌ই শ্রেষ্ঠ। দর্শন-বিশুদ্ধির জন্য এই-ই হইল পথ, অন্য পথ নাই;

---

(১) অষ্টাঙ্গিক মার্গ শব্দের অর্থ হইল আটটি অঙ্গযুক্ত পথ, বুদ্ধদেব এই অষ্ট-অঙ্গ যুক্ত পথকেই অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে তিনটি অঙ্গ হইল 'শীল' সম্বন্ধীয়, তিনটি হইল 'চিত্ত' সম্বন্ধীয়, আর দুইটি হইল 'প্রজ্ঞা' সম্বন্ধীয়। শীল সম্বন্ধীয় তিনটি অঙ্গ হইল :—

(এক) সম্যক্ বাক্য (অর্থাৎ মিথ্যাবাদ, পিশুনবচন, পৌরুষবচন ও প্রলাপ বচন হইতে বিরত থাকা),

(দুই) সম্যক্ কর্মান্ত (অর্থাৎ অদত্তাদান [যাহা অদত্ত তাহার আদান], প্রাণাতিপাত, কামসমূহে মিথ্যাচার, অব্রহ্মচর্য—প্রভৃতি হইতে বিরত থাকা);

(তিন) সম্যক্‌আজীব (অর্থাৎ জীবিকা-অর্জনের জন্য সৎ-পন্থা অবলম্বন)।

তোমরা এই মার্গকেই অবলম্বন কর,—এই মার্গ মারকেও প্রমোহিত করে (২৭৩-৭৪)। এই মার্গ অনুসরণ করিয়া তোমরা দুঃখের অন্ত করিবে, এই মার্গকে শল্য-উৎপাটনের উপায় জানিয়াই ইহার কথা আমি উপদেশ করিয়াছি।'

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব উপাসকবৃন্দকে সাবধান করিয়া দিলেন,—'উত্তম চেষ্টা তোমাদিগকেই করিতে হইবে, তথাগতগণ শুধু ধর্মের ব্যাখ্যাতা; এই পথ যাহারা অবলম্বন করিয়াছে—এবং যাহারা জ্ঞানী—মারবন্ধন হইতে তাহারাই প্রমুক্ত হয়।'

তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা।
পটিপন্না পমোক্খন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা॥ (২৭৬)

এই মারের প্রসঙ্গ অতি কবিত্বময় কৌশলে এবং নাটকীয় ভঙ্গিতে অবতারণা করা হইয়াছে 'সুত্তনিপাতে'র 'উরগবগ্‌গে'র অন্তর্গত 'ধনিয়-সুত্তে'। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, এখানে মারের প্রসঙ্গ খুব অল্প এবং গৌণ—শুধুমাত্র শেষের দিকে একটি শ্লোকে 'পাপিমা মারে'র প্রলোভন-উক্তি দেখিতে পাই; বাকি সমগ্র কবিতাটিই হইল একটি সাধারণ গৃহস্থ ধনিয় গোপ (ধনিক) এবং ভগবান্ বুদ্ধের উক্তি-প্রত্যুক্তি। ধনিয় গোপ হইল একটি সুখী সন্তুষ্ট সাধারণ গৃহস্থ, তাহার ছোট্ট কুটির, কিছু গোধন, নিজ মতানুসারী স্ত্রী-পুত্র, আত্মোপার্জিত

চিত্ত-সম্বন্ধীয় তিনটি অঙ্গ হইল :—

(চার) সম্যক্ ব্যায়াম (অর্থাৎ যাহাতে অনুৎপন্ন অকুশল চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন না হইতে পারে, উৎপন্ন অকুশল চিত্তবৃত্তি দূর হয়, অনুৎপন্ন কুশল চিত্তবৃত্তিসমূহের উৎপত্তি হয় এবং উৎপন্ন কুশল চিত্তবৃত্তিসমূহ বর্ধিত হয় তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা).

(পাঁচ) সম্যক্ স্মৃতি (অর্থাৎ কায়, বেদনা ও চিত্ত সংক্রান্ত যাহা কিছু সংঘটিত হইবে সেই সম্বন্ধে এবং জগতের ধর্মসমূহ (বস্তুনিচয়) সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত থাকা).

(ছয়) সম্যক্ সমাধি (অর্থাৎ বিবিধ প্রকারের ধ্যান).

প্রজ্ঞা-সম্বন্ধীয় দুইটি অঙ্গ হইল :—

(সাত) সম্যক্‌সংকল্প (অর্থাৎ বিষয়-ত্যাগ, কাহাকেও দ্বেষ না করা, অহিংসা প্রভৃতি বিষয়ে সংকল্প);

(আট) সম্যক্ দৃষ্টি (অর্থাৎ দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায় সম্বন্ধে ঠিক ঠিক দৃষ্টি)।

চারিটি আর্যসত্য হইল—দুঃখ, দুঃখ-সমুদয় (দুঃখের উৎপত্তির কারণ), দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধের উপায়।

অন্ন বিত্ত—এই সব লইয়াই সে মহাখুশী। কবিতাটিতে ধনিয় গোপের সুখ-সন্তুষ্ট সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের একটি অতিশয় মনোরম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার ঠিক পাশে পাশে অঙ্কিত হইয়াছে ভগবান্ বুদ্ধের প্রব্রজিত জীবনের আত্মসংযত ও আত্মসংহৃত বাসনামুক্ত জীবনের অপূর্ব ছবিটি। শেষের শ্লোকে যে মারের উক্তি দেখিতে পাই তাহা আমার নিকট গভীর ব্যঞ্জনাগর্ভ মনে হইয়াছে। মার যেন সমস্ত দৃশ্যটিরই নেপথ্যে দাঁড়াইয়াছিল এবং ধনিয় গোপের গার্হস্থ্য জীবনের ভিতর দিয়া নিজের মোহিনী শক্তিকেই বিস্তার করিতেছিল প্রব্রজিত ধ্যান-পরায়ণ বুদ্ধের চারিপাশে। এখানকার ব্যঞ্জনাটি আমার এইরূপ মনে হয়,—মারের প্রভাব যেখানে অতি উৎকটভাবে আসিয়া দেখা দেয় সেখানে মানুষের মনে হয়ত সহজেই একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু একটি সাধারণ মানুষ তাহার স্ত্রীপুত্র পরিজনের ছোট্ট সংসার লইয়া যে সুখের নীড় রচনা করে তাহার প্রলোভন বড় মৃদু ও কোমল, সুতরাং সেই জীবনের স্নিগ্ধ আকর্ষণ চিত্তকে মনের অজ্ঞাতেও আকর্ষণ করে। মার যেন সেই একটি স্নিগ্ধ আকর্ষণ বিস্তার করিয়া দিয়াছে ধনিয় গোপের জীবন-চিত্রের ভিতর দিয়া। মার যখন দেখিল, ভগবান্ বুদ্ধের নিকটে তাহার এ-জাতীয় সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইয়া গেল তখন আর তাহার নেপথ্যে লুকাইয়া থাকা সম্ভব হইল না—প্রকাশ্যে বাহির হইয়াই তখন আত্ম-সমর্থনে কথা বলিতে হইল।

কবিতাটিতে একটি পদ আছে ধ্রুব-পদের ন্যায়,—'অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব'—'হে মেঘের দেবতা, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তুমি প্রবর্ষণ করিতে পার।' আকাশে ঘন মেঘ করিয়া আসিয়াছে, চারিদিকে প্রবল বর্ষণের আয়োজন; কিন্তু সেই আয়োজনে ধনিয় গোপের কোনও ভয় নাই,—সে মেঘের দেবতাকে ডাকিয়া বলিতেছে,—আমি প্রস্তুত আছি—ইচ্ছা হয় প্রবল বর্ষণ কর। কেন এই নিঃশঙ্ক মনোভাব? ধনিয় গোপ বলিতেছে,—

পক্কোদনো দুদ্ধখীরোঽহমস্মি
অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো।
ছন্না কুটি আহিতো গিনি
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব॥

'আমার খাবার পাক করা হইয়াছে, দুধ দোহান হইয়াছে, মহীনদীর তীরবর্তী দেশে আমরা বাস করি সমানবয়সী গোয়ালারা; ছাওয়া আছে

আমার কুটির, যোগাড় করিয়া রাখিয়াছি আগুন (রাত্রি-বিকালে অসময়ে প্রয়োজনের জন্য),—তারপরে যদি তুমি ইচ্ছা কর, হে মেঘের দেবতা, তুমি বর্ষণ করিতে পার।'

দূর হইতে শুনিতে পাইলেন এই কথা ভগবান্ গৌতম, তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহারই বা মেঘবৃষ্টির জন্য ভয় কি? তিনিও ধনিয় গোপের সুর এবং ভাষাতেই বলিয়া উঠিলেন—

অক্কোধন বিগতখিলোঽহমস্মি
অনুতীরে মহিয়া একরত্তিবাসো।
বিবটা কুটি নিব্বুতো গিনি
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব॥

'আমি অক্রোধন, বিগতখিল (অর্থাৎ মনের মধ্যে নাই আর কোনও খোঁটা) মহীনদীর তীরবর্তী দেশে একরাত্রির জন্যই করি বাস, বিবৃত আমার কুটির (অর্থাৎ উন্মুক্ত আকাশতলেই আমার বাস—নির্দিষ্ট কোনও ঘর নাই)—আর নিভানো আছে (মনের সব) আগুন, ইহার পরে যদি ইচ্ছা কর, প্রবল বেগে বর্ষণ কর, হে মেঘের দেবতা।'

অল্প রঙ ও রেখার পাশা-পাশি অঙ্কিত দুই খানি ছবি, একখানিতে উচ্চাভিলাষহীন স্বল্পসন্তুষ্ট জীবনের ছোট্ট ছবি—অপরখানিতে প্রশান্তি, পবিত্রতা, বৈরাগ্য—মহত্তের মহিমা,—ছন্দের ভিতর দিয়া দুইটি ছবিই সমুজ্জ্বল। এইরূপই পাশাপাশি চলিতেছে দুইখানি চিত্রের বর্ণনা।

ধনিয় বলিতেছে,—'এখানে নাই ডাশ-মশার উৎপাত, তৃণাচ্ছাদিত জলাভূমিতে চরিয়া বেড়ায় গাভীগুলি—বৃষ্টি আসিলে বেশ সহ্য করিতে পারিব।' বুদ্ধদেব বলিতেছেন,—'ভাল ভাবে তৈয়ারী আমার ভেলা বাঁধা আছে, সকল প্লাবন বশীভূত করিয়া আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি পারগত, এখন আর ভেলায় নাই কোনও কাজ,—এখন যদি ইত্যাদি।' ধনিয় আবার বলিতেছে,—

গোপী মম অস্সবা অলোলা
দীঘরত্তং সংবাসিয়া মনাপা।
তস্সা ন সুণামি কিঞ্চি পাপং
অথ চে ইত্যাদি।

'ঘরের গোপী (স্ত্রী) আমার আজ্ঞানুসারিণী এবং অচঞ্চলা, মনোজ্ঞা সে বহু

দিন করিয়াছে আমার সঙ্গে এক সঙ্গে বাস ; তাহার সম্বন্ধে কখনও শুনি নাই আমি কোনও পাপের কথা,—ইহার পরে ইত্যাদি।'

বুদ্ধদেব এ-কথা শুনিয়া বলিলেন,—

চিত্তং মম অস্সবং বিমুত্তং
দীঘরত্তং পরিভাবিতং সুদন্তং।
পাপং পন মে ন বিজ্জতি
অথ চে ইত্যাদি।

'চিত্ত আমার আজ্ঞাকারী এবং বিমুক্ত, দীর্ঘকাল সুশীলিত হইবার জন্ত সম্যকরূপে বশীভূত ; কোন পাপই নাই আমার,—ইহার পরে ইত্যাদি।'

ধনিয় গোপ বলিল,—'আমি হইতেছি 'আত্মবেতনভৃত'—নিজের শ্রমে যে বেতন পাই, তাহাতেই নির্বাহিত হয় আমার জীবনযাত্রা, পুত্রেরা আছে মিলিয়া-মিশিয়া—স্বাস্থ্যবান্ আমার পুত্রগণ, তাহাদের শুনি নাই কোনও পাপের কথা।'

বুদ্ধদেব উত্তরে বলিলেন,—'আমি ভৃত্য নই কাহারও,—বিশঙ্ক মুক্তভাবে বিচরণ করি সর্বলোকে, কোনও রূপ 'ভাতা'য়ই নাই আমার প্রয়োজন।'—

ধনিয় বলিল,—'আমার আছে বৎস, গাভী—বৃষ,'—বুদ্ধদেব বলিলেন 'আমার নাই ইহার কিছুই' ; ধনিয় বলিল, তাহার যে শুধু বিভিন্ন ধরনের গোধন রহিয়াছে তাহা নহে,—এই সব গোরুর গোঁজ শক্ত করিয়া মাটিতে পোঁতা আছে, একটুও সেগুলি কাঁপে না, নূতন মুঞ্জাতৃণের দড়ি দিয়া সেগুলি আছে ঠিকঠাক ভাবে বাঁধা,—সে দড়ি বৎসগুলি কিছুতেই ছিঁড়িতে পারিবে না। শুনিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন,—

উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনানি
নাগো পূতিলতং ব দালয়িত্বা।
নাহং পুনঃ উপেস্সং গব্ভসেয্যং
অথ চে ইত্যাদি।

'বৃষের ন্যায় ছিঁড়িয়া সকল বন্ধন, হাতী যেমন পূতিলতাকে দলন করে তেমনই (সকল বাধাকে) দলন করিয়া আমি আর কখনও গর্ভশয্যায় আসিব না, ইহার পরে ইচ্ছা করিলে প্রবলভাবে বর্ষণ করিতে পার হে মেঘের দেবতা!'

তখন ধারাসারে বৃষ্টি নামিল, নিম্নভূমি এবং স্থলসমূহ সমস্ত পূর্ণ করিয়া

মহামেঘ তখনই করিল প্রচুর বর্ষণ ; সেই বর্ষণমুখর মেঘের ধ্বনি শুনিয়া ধনিয় গোপ এই কথা বলিল,—

লাভা বত নো অনপ্পকা
যে ময়ং ভগবন্তং অদ্দসাম।
সরণং তং উপেম চক্খুম
সথা নো হোহি তুবং মহামুনি॥
গোপী চ অহং চ অস্সবা
ব্রহ্মচরিয়ং সুগতে চরামাসে।
জাতিমরণস্স পারগা
দুক্খস্স' অন্তকরা ভবামসে॥

'লাভ আমাদের দেখ কম হইল না,—যে আমরা ভগবানকে দেখিতে পাইলাম ; তোমারই শরণ লইলাম হে চক্ষুষ্মান্, তুমি আমাদের শাস্তা হও হে মহামুনি! আমার স্ত্রী আর আমি—উভয়েই তোমার আজ্ঞাবহ,—হে সুগত, আমরা আচরণ করিব ব্রহ্মচর্য, (এইভাবেই) জন্মমরণের পারগামী হইব আমরা—আর হইব দুঃখের অন্তকারী।'

মার এতক্ষণ নেপথ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল, ধনিয় গোপও ভগবান্ বুদ্ধের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে দেখিয়া সে নেপথ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিল—কলাকৌশল বাদ দিয়া সোজা বলিয়া বসিল,—

নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা
গোমিকো গোহি তথে'ব নন্দতি।
উপধী হি নরস্স নন্দনা
ন হি সো নন্দতি যো নিরূপধী॥

'পুত্রসমূহের দ্বারাই পুত্রবান্ নন্দিত হয়, গোরুসমূহের দ্বারা সেই ভাবে আনন্দিত হয় গোমিক, কিছু থাকাই হইল মানুষের আনন্দ,—সে আনন্দিত হয় না যাহার কিছুই নাই।'

ভগবান্ বুদ্ধও এ-কথা শুনিতে পাইয়া তেমনি স্পষ্টভাবেই মারকে উল্টাইয়া বলিলেন,—

সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা
গোমিকো গোহি তথে'ব সোচতি।
উপধী হি নরস্স সোচনা
ন হি সো সোচতি যো নিরূপধী॥

'পুত্রসমূহ হেতুই শোক করে পুত্রবান্, সেই গাভীসমূহের দ্বারা শোক করেন গোধিক ; কিছু থাকাই হইল মানুষের শোকের কারণ, সে কখনও শোক করে না যাহার কিছুই নাই।'

সম্যক্-সম্বোধির জন্য দৃঢ়মানস হইয়া বোধিবৃক্ষমূলে পর্যঙ্কবন্ধনে নিষণ্ণ বুদ্ধের প্রতি সসৈন্য মারের আক্রমণ যুদ্ধ এবং পরাজয়ের একটি বিশদ বিবরণ আমরা দেখিতে পাই 'নিদানকথা'র মধ্যে। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল এই,—

কামং তচো চ নহারু চ অট্‌ঠি চ অবসুস্‌সতু, উপসুস্‌সতু সরীরে মংস-লোহিতং, ন ত্বেব সম্মাসম্বোধিং অপ্পত্বা ইমং পল্লংকং ভিন্দিস্‌সামি। 'আমার এই ত্বক্, শিরা, অস্থি—সব শুষ্ক হইয়া যাক, শরীরের মাংস, শোণিত সব শুকাইয়া যাক্ কিন্তু সম্যক্-সম্বোধি লাভ না করিয়া এই আসন আমি পরিত্যাগ করিব না।' এই প্রতিজ্ঞা লইয়া সিদ্ধার্থ অশনিশত-সন্নিপাতেও অভেদ্যরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কুমার সিদ্ধার্থকে বশীভূত করিবার জন্য নানা প্রহরণে সজ্জিত হইয়া সমস্ত মারবলসহ মার তাহার বাহন 'গিরিমেখলা'য় আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল,—আর দিক্‌চক্রবালে দেবগণ মহাসত্ত্ব সিদ্ধার্থের স্তুতিগান করিয়া এই মার-বিজয় দর্শন করিতে-ছিলেন। মারবলের ভিতরে কেহই বোধিমণ্ডের কাছেও ঘেঁষিতে পারিল না, সকলেই একে একে পলায়ন করিল—একাকী বসিয়া রহিলেন মহাপুরুষ সিদ্ধার্থ।

পরাজিত মার তাহার পার্ষদবর্গকে ডাকিয়া বলিল, 'শুদ্ধোধন পুত্র এই সিদ্ধার্থের সদৃশ আর অন্য পুরুষ নাই,—ইহার সহিত সম্মুখযুদ্ধে আমরা আঁটিয়া উঠিতে পারিব না, পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ করিব। মহাপুরুষ সিদ্ধার্থ তিন পার্শ্বে একবার তাকাইয়া ভাবিলেন, এই মারবল আমাকে এখানে একাকী অসহায় ভাবিয়া সমস্ত প্রহরণদ্বারা আমাকে পরাস্ত করিবার চেষ্টায় আছে ; আমার এই যে দশ পারমিতা—ইহাই আমার 'পুষ্টপরিজন সদৃশ'—এইগুলিই আমার ফলক—এইগুলি প্রহার করিয়াই মারবল ধ্বংস করিব ; ইহা ভাবিয়া তিনি দশপারমিতা অবলম্বন করিয়া অভেদ্য অপরাজিতরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

মার দেখিল এ-রূপেও কোন ফল হইবে না। সে তখন বাতাসমূহকে অবলম্বন করিল—কিন্তু মার যে বাতাসমূহ সমুত্থিত করিল তাহা দ্বারা পর্বতকূট সমূহ আকুল হইয়া উঠিল, বনের বৃক্ষলতা উন্মূলিত হইতে লাগিল, চারিদিকে

গ্রাম-নিগম চূর্ণবিচূর্ণ হইতে লাগিল,—কিন্তু বোধিসত্ত্বের পুণ্যবলে তাঁহার চীবর-খণ্ডও কেহ সঞ্চালিত করিতে পারিল না। মার উদকবলের আশ্রয় গ্রহণ করিল, শতপটলে সহস্রপটলে ঘনমেঘ বর্ষণ আরম্ভ করিল—বৃষ্টিধারাবেগে পৃথিবী ছিন্ন হইয়া গেল, বনবৃক্ষের উপরভাগেই মহাপ্লাবন দেখা দিল—কিন্তু ভিজিল না শুধু মহাসত্ত্ব সিদ্ধার্থের চীবরচণ্ড। মার পাষাণ বর্ষণ করাইল—প্রহরণ-বর্ষণ করাইল—অঙ্গারবর্ষণ করাইল; কিন্তু আশ্চর্য—'কিংসুকবণ্ণা অঙ্গারা আকাসেনাগন্ত্বা বোধিসত্তস্স পাদমূলে দিব্বপুপ্‌ফানি হুত্বা বিকিরিংসু।'—'কিংশুকবর্ণ অঙ্গারগুলি আকাশ দিয়া আসিয়া বোধিসত্ত্বের পাদমূলে দিব্যপুষ্প হইয়া বিকীর্ণ হইয়া পড়িল!' মার ভস্মবর্ষণ করাইল, কিন্তু 'অচ্চুণ্‌হো অগ্‌গিবণ্ণো কুকুড়ো আকাসেনাগন্ত্বা বোধিসত্তস্স পাদমূলে চন্দনচুণ্ণং হুত্বা নিপতি'— 'অত্যুষ্ণ অগ্নিবর্ণ ভস্মরাশি আকাশপথে আসিয়া বোধিসত্ত্বের পাদমূলে চন্দনচূর্ণ হইয়া নিপতিত হইল।' মার কর্দম-বর্ষণ করাইল, সে কর্দমরাশি বোধিসত্ত্বের পাদমূলে আসিয়া পতিত হইল 'দিব্যবিলেপন' রূপে। মার চারিদিকে অন্ধকার সৃষ্টি করিল, কিন্তু সেই অন্ধকার 'সূর্য-প্রভাবিহত' হইয়াই যেন অন্তর্হিত হইল। নানা ভাবে পরাজিত ক্রুদ্ধ মার ক্রোধবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সিদ্ধার্থের প্রতি চক্রায়ুধ বিসর্জন করিল,—দশপারমিতা অবলম্বনকারী সেই মহাপুরুষের উপরিভাগে তাহা মালাবিতান হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তারপরে বোধিসত্ত্ব মারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার দানের কে সাক্ষী?' মার মারবলের অভিমুখে হস্ত প্রসারিত করিল,—অমনি সমগ্র মার-বল 'আমি সাক্ষী, আমি সাক্ষী' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। আবার মার সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমার দানের কে সাক্ষী?' সিদ্ধার্থ বলিলেন,—'আমার সাক্ষী মহা পৃথিবী'—এই বলিয়া তিনি চীবরের ভিতর হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া পৃথিবীর অভিমুখে তাহা প্রসারিত করিলেন—মহাঘোষে পৃথিবী হইতে শব্দ উঠিল—'হাঁ, তোমার মহাদানের আমি সাক্ষী'। সবাহন মার ভয়ে পলাইয়া গেল,—দেবগণ বোধিসত্ত্বের জয়গানে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

'নিদান-কথা'র ভিতরে সিদ্ধার্থের মার বিজয়ের এই যে বর্ণনা দেখিতে পাইলাম ইহার স্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাই অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ-চরিতে'র 'মার-বিজয়' নামক ত্রয়োদশ সর্গে। অশ্বঘোষ এই বর্ণনাকে নানা ভাবে বিস্তার করিয়াছেন,—কবি-কল্পনায়ও বিস্তার করিয়াছেন—আবার তাহার সহিত মার সম্বন্ধে নানা প্রকার লৌকিক বিশ্বাস যুক্ত করিয়াও বিস্তার করিয়াছেন।

এখানে দেখি, রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বোধিবৃক্ষমূলে অপর সকলেই সন্তুষ্ট হইল—কিন্তু ভীত হইয়া পড়িল মার। এই মারের পরিচয়ে বলা হইয়াছে,—

যং কামদেবং প্রবদন্তি লোকে
চিত্রায়ুধং পুষ্পশরং তথৈব।
কামপ্রচারাধিপতিং তমেব
মোক্ষদ্বিষং মারমুদাহরন্তি " (১৩।২)

'লোকে যাহাকে কামদেব বলে—চিত্রায়ুধ পুষ্পশরও বলে কামপ্রচারের অধিপতি মোক্ষদ্বিষ তাহাকেই মার বলা হয়।'

এই মারের তিনটি পুত্র,—বিভ্রম, হর্ষ এবং দর্প ;—আর তিনটি কন্যা,—রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা। এই পুত্রকন্যাগণের নিকটে নিজের ভয় ও বিষাদের কথা বলিয়া মার বলিল—

যাস্যামি তাবদ্ব্রতমস্য ভেত্তুং
সেতুং নদীবেগ ইবাতিবৃদ্ধঃ॥ (ঐ—৬)

'অতিবর্ধিত নদীবেগ যেমন করিয়া সেতু ভাঙিয়া ফেলে সেইরূপ আমি তাহার (সিদ্ধার্থের) ব্রত ভঙ্গ করিতে যাইব।'

তখন মার পুষ্পময় ধনু ও জগন্মোহকর পাঁচটি শর গ্রহণ করিয়া সেই অশ্বত্থমূলে উপস্থিত হইল। প্রথমে সে নানা প্রকার চাটুবাক্য এবং ভীতিপূর্ণ বাক্য দ্বারা ধ্যানস্থ মুনিকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল; তাহাতে শাক্যমুনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না দেখিয়া মার তাঁহার উপর শর নিক্ষেপ করিল। তাহাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল দেখিয়া মার বুঝিল, শাক্যমুনির উপর পুষ্পশর নিক্ষেপ করিয়া কোনই ফল হইবে না. তখন সে ঠিক করিল সমগ্র ভূতগণের দ্বারা তর্জন গর্জন এবং ভয়োৎপাদনের দ্বারাই শাক্যসিংহকে পরাজিত এবং বশীভূত করিতে হইবে। তখন শাক্যমুনিকে বিধ্বস্ত করিতে অভিলাষী মার নিজ সৈন্যবর্গকে স্মরণ করিল, নানা প্রকার আকারধারী অনুচরবর্গও বাণ, বৃক্ষ, শূল, গদা, খড়্গ প্রভৃতি লইয়া আসিয়া চতুর্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এই মারসৈন্যগণের কাহারও মুখ শূকরের মত, কাহারও মৎস্যের মত, কাহারও অশ্বের, কাহারও গর্দভের, কাহারও উষ্ট্রের, কাহারও ব্যাঘ্রের, কাহারও ভল্লুকের, কাহারও সিংহের, কাহারও হস্তীর মত। কতকগুলির একচক্ষু, কতকগুলির অনেক মুখ, কাহারও তিনটি মাথা, কতকগুলি লম্বোদর, কতকগুলি বৃষোদর। এইরূপে অশ্বঘোষ মারের অনুচরবর্গের বীভৎস রূপের এবং ততোধিক বীভৎস ভীতি-উৎপাদক কার্যকলাপের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে অশ্বঘোষ তৎকালীন লোকবিশ্বাসেরই যেন একটি দীর্ঘ পরিচয় দিয়াছেন। ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, পিশাচাদি সম্বন্ধে এবং তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে সকল লৌকিক বিশ্বাস তাহারই সুনিপুণ বর্ণনা দেখিতে পাই এই দৃশ্যগুলিতে। এই বর্ণনায় 'নিদানকথা'র বর্ণনার সঙ্গে স্থানে স্থানে বেশ মিল আছে ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সিদ্ধার্থের প্রতি বর্ষিত অঙ্গার কিংশুকবর্ণ দিব্যপুষ্পের ন্যায় বোধিসত্ত্বের পদমূলে শোভা পাইতেছিল, এ বর্ণনা আমরা 'নিদান-কথা'য় দেখিয়াছি। এখানেও দেখি, কোন অনুচর প্রজ্বলিত সূর্যের ন্যায় আকাশে উত্থিত হইয়া প্রচণ্ড অঙ্গার বর্ষণ করিতেছিল; ঐ অঙ্গার-বর্ষণ কল্পের অন্তায়ে (প্রলয়কালে) প্রদীপ্ত সুমেরু পর্বত কর্তৃক সুবর্ণ কন্দরচূর্ণের ন্যায় হইয়াছিল। আর—

তদ্বোধিমূলে প্রবিকীর্যমাণ-
মঙ্গারবর্ষং তু সবিস্ফুলিঙ্গম্।
মৈত্রীবিহারাদৃষিসত্তমস্য
বভূব রক্তোৎপলপত্রবর্ষঃ॥ (ঐ-৪২)

'সেই বোধিমূলে বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত সেই অঙ্গারবর্ষ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; ঋষি-সত্তমের মৈত্রীবিহার হেতু (সর্বভূতে মৈত্রীভাব অবলম্বন করিয়া অধিষ্ঠান হেতু) তাঁহার কাছে সেগুলি রক্তপদ্মের পত্রের বর্ষণের মত হইয়াছিল। এই সকল ভীতিপ্রদর্শন ও অত্যাচারে মহামুনির কোনও চাঞ্চল্যই দেখা দিল না,—বন্ধুকে মানুষ যেমন করিয়া রক্ষা করে নিজের সঙ্কল্পকেও তিনি তেমন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন,—'স্বনিশ্চয়ং বন্ধুমিবোপগুহ্য'। ইহার পরে মারের অনুচরগণের মধ্য হইতেই একটি বিশিষ্ট অনুচর মারকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যে কথাগুলি আকাশ হইতে অদৃশ্যরূপে ডাকিয়া বলিয়াছিল তাহার ভিতরে কতগুলি ভাব ও প্রকাশভঙ্গি উভয় দিক হইতেই চমৎকার। সে মারকে স্পষ্ট বলিয়া দিল—

নৈষ ত্বয়া কম্পয়িতুং হি শক্যো
মহাগিরির্মেরুরিবানিলেন॥ (ঐ-৫৭)

'বাতাস যেমন মহাগিরি মেরুকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ তুমিও ইঁহাকে কম্পিত করিতে পারিবে না।'

অপ্যুষ্ণভাবং জ্বলনঃ প্রজহ্যা-
দাপো দ্রবত্বং পৃথিবী স্থিরত্বম্।
অনেককল্পাচিতপুণ্যকর্মা
ন ত্বেব জহ্যাদ্ব্যবসায়মেষঃ॥ (ঐ-৫৮)

'অগ্নি যদি তাহার উষ্ণভাব ত্যাগ করে, জল যদি তাহার দ্রবত্ব ত্যাগ করে, পৃথিবী স্থিরতা ত্যাগ করে—তথাপি অনেককল্প ধরিয়া পুণ্যসঞ্চয়কারী এই ঋষি কিছুতেই নিজের এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন না।'

'যো নিশ্চয়ো হ্যস্য পরাক্রমশ্চ
তেজশ্চ যদ্ যা চ দয়া প্রজাসু।
অপ্রাপ্য নোত্থাস্যতি তত্ত্বমেব
তমাংস্যহত্বেব সহস্ররশ্মিঃ॥ (ঐ-৫১)

'ইঁহার যেরূপ নিশ্চয়, যেরূপ পরাক্রম—যেরূপ তেজ—জীবগণে যেরূপ দয়া—(তাহাতে মনে হয়) ইনি তত্ত্ব লাভ না করিয়া কিছুতেই উঠিবেন না—সহস্ররশ্মি (সূর্য) যেমন তমঃসমূহকে বিনাশ না করিয়া উঠে না।'

সত্ত্বেষু নষ্টেষু মহান্ধকারে
জ্ঞানপ্রদীপঃ ক্রিয়মাণ এষঃ।
আর্যস্য নির্বাপয়িতুং ন সাধু
প্রজ্বাল্যমানস্তমসীব দীপঃ॥ (ঐ-৬৩)

'মহান্ধকারে সত্ত্বসমূহ (জীবসমূহ) যখন নষ্ট হইতে বসিয়াছে, তখন ইনি জ্ঞানপ্রদীপের ন্যায় দীপ্যমান; অন্ধকারে প্রজ্বাল্যমান দীপকে কোনও প্রাজ্ঞব্যক্তির নির্বাপণ করা উচিত নয়।'

ক্ষমাশিফো ধৈর্যবিগাঢমূল
শ্চারিত্রপুষ্পঃ স্মৃতিবুদ্ধিশাখঃ।
জ্ঞানদ্রুমো ধর্মফলপ্রদাতা
নোৎপাটনং হ্যর্হতি বর্ধমানঃ॥ (ঐ-৬৫)

'ক্ষমা যাহার শিকড়, ধৈর্য হইল গভীর মূল, চারিত্র পুষ্প, স্মৃতি ও বুদ্ধি যাহার শাখা—ধর্মফলের প্রদাতা এমন যে বর্ধমান জ্ঞানবৃক্ষ তাহার উৎপাটন কিছুতেই উচিত নয়।'

পঞ্চধ্যানিবুদ্ধ

বাঙলা দেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের একটা বিশেষ রূপ ছিল। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বৌদ্ধমত বাঙলা দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই যুগের বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত আপোষ নিষ্পত্তির দ্বারা একটি বিশেষ রূপান্তর লাভ করিয়াছিল। তাহারই সঙ্গে আবার যুক্ত হইয়াছিল বাঙলা দেশের তন্ত্র-সাধনা।

প্রাচীন বাঙলা-সাহিত্যের ভিতরে আমরা বহু স্থানে পঞ্চধ্যানিবুদ্ধ বা তাঁহাদের রূপান্তরের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করি। এই জন্যই পঞ্চধ্যানি বুদ্ধের পিছনকার তত্ত্বটি একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার।

বাঙলা দেশে যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত ছিল সেই বৌদ্ধধর্মের শীর্ষস্থানে ছিলেন বজ্রসত্ত্ব বুদ্ধ। 'বজ্রসত্ত্ব' কথার অর্থ 'শূন্যতা-সত্ত্ব'। 'বজ্র' দৃঢ়, সার, অচ্ছিদ্র, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী এবং অবিনাশী—এই রূপ শূন্যতাকেই বজ্র বলা হইয়া থাকে।

দৃঢ়ং স রমসৌশীর্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে॥

(অদ্বয়-বজ্র-সংগ্রহ)

এই বজ্রই 'সত্ত্ব' যাঁহার তিনিই বজ্রসত্ত্ব। এই বজ্রসত্ত্বই আদিবুদ্ধ, তিনিই জগৎ-প্রপঞ্চের আদি কারণ। এই আদি কারণ হইতেই সমগ্র সৃষ্টির আবির্ভাব হইলেও তিনি নিজে স্রষ্টা নহেন। তিনি শুদ্ধজ্ঞানময়তনু, জ্ঞানবীজাকারেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার ভিতরে সম্ভাবনারূপে নিহিত আছে। আদিবুদ্ধ বা বজ্রসত্ত্বের যে জ্ঞানময়তনু তাহার ভিতরে পাঁচটি জ্ঞান রহিয়াছে, এই পঞ্চ জ্ঞান তাঁহার স্বরূপের ভিতরেই বিধৃত। এই পঞ্চ জ্ঞান যেন তাঁহার স্বরূপেরই পঞ্চ-গুণ। এই পঞ্চজ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত স্বরূপভূত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজেই এই জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন নহেন, এই পঞ্চ জ্ঞান সম্বন্ধে আদিবুদ্ধের যে পৃথক্ পৃথক সচেতনতা তাহাকেই বলা হয় তাঁহার পঞ্চ ধ্যান। এই পাঁচ প্রকারের ধ্যান হইতেই পঞ্চস্কন্ধাত্মক বা পঞ্চভূতাত্মক জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি। আদিবুদ্ধের এই পঞ্চধ্যান হইতে পাঁচটি দেবতার আবির্ভাব হয়, ইঁহারাই পঞ্চধ্যানিবুদ্ধ।

আসলে এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধ আদিবুদ্ধের ধ্যানেরই মূর্তবিগ্রহ। একই 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা' প্রথমে নিজের ভিতরে নিজে পঞ্চধা বিভক্ত হইল; এই পঞ্চধা ভাগই সৃষ্টির প্রথম প্রক্রিয়া,—কারণ ভাগহীন যে 'এক' তাহার ভিতরে সৃষ্টি-সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া আছে। একই 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা' পঞ্চধা ভাগের দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানে পর্যবসিত হইল, পঞ্চ জ্ঞান রূপান্তরিত হয় পঞ্চ ধ্যানে, পঞ্চ ধ্যানের বিগ্রহীভূত অবস্থাই পঞ্চধ্যানিবুদ্ধ।

এই পঞ্চবুদ্ধই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। এই পঞ্চ বুদ্ধ হইলেন বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘ-সিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। বৈরোচন রূপস্কন্ধের দেবতা, রত্নসম্ভব বেদনার, অমিতাভ সংজ্ঞার, অমোঘসিদ্ধি সংস্কারের, অক্ষোভ্য বিজ্ঞানের দেবতা।

পরবর্তী কালের এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধতত্ত্বের বিকাশে আমরা সাংখ্যদর্শনের কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের পঞ্চস্কন্ধের পরিকল্পনা পরবর্তী কালের পঞ্চভূতের পরিকল্পনার সহিত গোলেমালে মিলিয়া গেল। সাংখ্য মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চভূত এবং চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্, এই পঞ্চেন্দ্রিয় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ এই পঞ্চ 'তন্মাত্রা' হইতে উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চ তন্মাত্রা কি? দার্শনিক পারিভাষিক অর্থের জটিলতাকে বাদ দিয়া বলা যাইতে পারে, এই পঞ্চ তন্মাত্রা হইল পঞ্চতত্ত্ব যাহার ভিতর দিয়া 'তৎ' পদার্থ বা একতত্ত্ব বিশিষ্টরূপে নির্ধারিত হইতেছে। পঞ্চ তন্মাত্রার সহিত আদিবুদ্ধের পঞ্চ ধ্যানের তুলনা করা যায় কি? পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে যেরূপে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়, পঞ্চ ধ্যান হইতে তেমনই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের আবির্ভাব হয়, এবং এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধ হইতেই ত পঞ্চ স্কন্ধের উৎপত্তি।

> রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এব চ
> পঞ্চবুদ্ধস্বভাবং তু স্কন্ধোৎপত্তি-বিনির্শ্চতম্॥
>
> (বজ্রবারাহীকল্প-মহাতন্ত্র)

এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধকেই বলা হয় পঞ্চ তথাগত। এই পঞ্চ তথাগতের ভিতরে বিজ্ঞানস্কন্ধের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অক্ষোভ্যকেই সাধারণত সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়। অন্য চারিস্কন্ধের চারিজন দেবতার ললাটে অক্ষোভ্যের মূর্তি মুদ্রিত করিয়া লইবার বিধান রহিয়াছে। অক্ষোভ্যের ললাটে আবার বজ্রসত্ত্বের মূর্তি মুদ্রিত করিয়া লইবার বিধান রহিয়াছে। এই বিধানের কারণ এই, পঞ্চস্কন্ধের ভিতরে বিজ্ঞানই চরম এবং অন্য চারিটি স্কন্ধ এই বিজ্ঞানেরই চারিটি পরিণাম

যায়; এই জন্যই চারি স্কন্ধের দেবতাগণকে বিজ্ঞানের দেবতা দ্বারা মুদ্রিত করিয়া লইবার বিধান। আবার বিজ্ঞানই চরম সত্য নহে, চরম সত্য হইল 'বজ্র' বা শূন্যতা, অতএব অক্ষোভ্যকেও বজ্রসত্ত্বের দ্বারা মুদ্রিত করিয়া লইতে হয়।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই পঞ্চ দেবতাকে দেহের মধ্যেই কল্পনা করা হইয়াছে। কারণ তান্ত্রিকমতে ব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্বই দেহভাণ্ডের ভিতরে নিহিত আছে। দেহের ভিতরে পঞ্চস্কন্ধাত্মক পাঁচটি নাড়ী আছে, এই পাঁচটি নাড়ীতেই পঞ্চ তথাগতের অধিষ্ঠান। মতান্তরে দেখিতে পাই, দেহের মস্তক-হৃদয়াদি পঞ্চস্থানে এই পঞ্চ দেবতার অবস্থিতি। মস্তকে বৈরোচনের অধিষ্ঠান, হৃদয়ে অক্ষোভ্যের বাস, নাভিতে রত্নসম্ভব, মুখে অমিতাভ এবং পাদে অমোঘসিদ্ধির অধিষ্ঠান। তান্ত্রিক সাধনার সর্বপ্রথম কথা দেহশুদ্ধি। এই দেহশুদ্ধি করিবার উপায় দেহের ভিতরে যেখানে যে তত্ত্বের অবস্থিতি সেই তত্ত্বগুলিকে অনুভব করা। তাই তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা দেহশুদ্ধির জন্য বা কায়-সাধনের জন্য প্রথমে এই পঞ্চ দেবতাকে বাহ্যদেহের পঞ্চ স্থানে বা পঞ্চ নাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেহের তত্ত্বময় রূপটি অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেন। দেহ যখন তত্ত্বময় হইয়া যায় তখন সে আর জড় দেহ থাকে না, সে যোগদেহে পরিণত হয়, পুনরায় যোগ-সাধনা দ্বারা এই যোগদেহই দিব্যদেহে পরিণত হয়।

চর্যাপদগুলির ভিতরে বহুস্থানে এই পঞ্চ তথাগতের উল্লেখ রহিয়াছে, আমরা এই প্রসঙ্গে একটি মাত্র উল্লেখের আলোচনা করিব। ত্রয়োদশ সংখ্যক পদে বলা হইয়াছে,—

> পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল।
> বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল॥
> ...
> চিঅ কন্নহার সুণত মাঙ্গে।
> চলিল কাহ্নু মহাসুহ সাঙ্গে॥

পদগুলির আক্ষরিক অর্থ হইল,—পঞ্চ তথাগতকে 'কেড়ুয়াল' অর্থাৎ দাঁড় করিয়া, হে কাহ্ন, কায়রূপ মায়াজাল বাও।...চিত্ত কর্ণধার শূন্যতার পথে, কাহ্ন মহাসুখের সঙ্গে (সঙ্গ লাভ করিবার জন্য) চলিল।

এখানে দেখিতেছি কায় বা দেহরূপ মায়াজাল বাহিতে হইলে পঞ্চ তথা-গতকে দাঁড় করিতে হইবে; অর্থাৎ এই পঞ্চ তথাগতের তত্ত্ব যদি দেহের ভিতরে সম্যক্-উপলব্ধি করা যায় তবেই পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহের আসল রূপটিকে

চেনা যায়। এই জ্ঞান এবং তাঁহার অনুভূতির দ্বারাই দেহ বিশুদ্ধ হয় এবং যোগের উপযোগী হয়।

এই জন্যই দেখিতে পাই, চর্যাপদের কয়েকটি সাধনপদের মধ্যে পঞ্চতথাগত রূপ কেড়ুয়াল (সং কৃপিটপাল) বা দাঁড়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

মাঙ্গত চড়্হিলে চউদিস চাহঅ।

কেড়ুয়াল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥ (৮ সং)

অর্থাৎ—'পথে চড়িলে (সাধনমার্গে প্রবেশ করিলে) চারিদিকে চাহিও; কেড়ুয়াল না থাকিলে কে পারে বাহিয়া যাইতে?' এখানেও কেড়ুয়াল থাকা শব্দের তাৎপর্য হইল এই পঞ্চতথাগততত্ত্বে প্রতিষ্ঠা; সেই তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাই সাধককে আগাইয়া দেয় সম্মুখের পথে। এই পঞ্চতথাগতকে অবলম্বন করিয়া আবার পঞ্চ সাধনপ্রণালী রহিয়াছে, তাহাও এই পঞ্চ কেড়ুয়ালের বাচ্য। এই পঞ্চ কেড়ুয়ালের আবার উল্লেখ পাই চতুর্দশ সংখ্যক পদে—

পঞ্চ কেড়ুয়াল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে—

'পাঁচটি কেড়ুয়াল যখন পড়িতেছে পথে।' (১৪ সং)

আবার এই পঞ্চ-তথাগতই পঞ্চস্কন্ধের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলিয়া অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য এই পঞ্চজনকে বিশাল করিবার কথা বলা হইয়াছে। ভুসুকুপাদ এক স্থানে বলিয়াছেন,—

জই তুম্হে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজণা।

নলিনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা ॥ (২৩ সং)

'যদি তুমি ভুসুকু আহেড়িয়ায় (শিকারে) যাইবে, তবে পঞ্চজনকে মারিবে; নলিনীবন (মহাসুখ-কমলবন) প্রবেশ করিতে হইলে একমনা হইবে।' অন্যত্রও বলা হইয়াছে,—

গঅবরেঁ তোলিয়া পাঞ্চজনা ঘালিউ। (১২ সং)

'গজবরকে (চিত্ত-গজবর) তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম।'

এই পঞ্চবুদ্ধ দেবতা লইয়াই পরবর্তী বৌদ্ধগণের সকল সাধনা। এই পঞ্চ দেবতাকে অবলম্বন করিয়াই বৌদ্ধতন্ত্রে মোহ, দ্বেষ, চিন্তামণি, রাগ ও সময় এই পঞ্চকুলের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরবর্তী বৌদ্ধ চৈত্যগুলিতে সাধারণতঃ চারিদিকে চারিটি দ্বারের কল্পনা রহিয়াছে, এই চারিদ্বারের চারিজন দেবতা, তাঁহারা অক্ষোভ্য ব্যতীত অন্য চারি তথাগত; অক্ষোভ্যের অবস্থান চৈত্যের চূড়ায়, তাঁহারও উর্ধ্বে অবস্থান বজ্রসত্ত্বের। পশ্চিম বাঙলার ধর্মপূজায় আবার এই পাঁচজন বুদ্ধ বা তথাগতই সেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই এবং গোশাঞি

এই পঞ্চ পণ্ডিতে রূপায়িত হইয়াছেন। ইঁহারাই ধর্মদেবতার পাঁচযুগের (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ও শূন্যযুগ বা অনাগত যুগ) পাঁচজন পূজারী, ধর্মদেবতা এখানে বজ্রসত্ত্বের প্রতিভূ।

পঞ্চবুদ্ধের প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা হিন্দুভাবধারার ভিতরেও প্রাচীনকাল হইতেই জানি 'তস্য জ্ঞানময়ং তপঃ'—তাঁহার সকল তপস্যাই জ্ঞানময়। আবার এই তপস্যা দ্বারাই সৃষ্টির আদি এক বহু হইয়াছিলেন, 'স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত'। আদিবুদ্ধের পঞ্চজ্ঞান এবং পঞ্চধ্যানের উদ্ভব কি এখান হইতেই?

চর্যাপদে বর্ণিত দার্শনিক তত্ত্ব

চর্যাপদগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে ইহার দুইটি দিক রহিয়াছে, একটি হইল দার্শনিক তত্ত্বের দিক, আর একটি হইল সাধনার দিক। দার্শনিক তত্ত্বের দিকটা ইহার প্রধান দিক নয়, প্রধান দিক হইল সাধন-তত্ত্বের দিক। ইহার কারণ হইল, চর্যাপদের কবিগণ ছিলেন মুখ্যতঃ একটি বিশেষ গুহ্যযোগপন্থার সাধক; তাঁহাদের সেই সাধনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং সেই সাধনালব্ধ বিচিত্র অনুভূতি—ইহার প্রকাশই ছিল তাঁহাদের মুখ্য লক্ষ্য। বৌদ্ধতন্ত্র এবং হিন্দুতন্ত্রগুলির মধ্যেও দেখিতে পাই, তর্কপ্রধান দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারে তাহাদের কোনও উৎসাহ নাই,—তাহাদের সমস্ত উৎসাহ হইল সাধনাদ্বারা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করা। চর্যাপদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক পটভূমিটি গৃহীত হইয়াছে সেই পটভূমিটি মোটামুটিভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতগুলি দ্বারাই গঠিত। মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের অন্তর্বর্তী মতগুলির মধ্যে দুইটি মতকে প্রধানভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে—একটি হইল নাগার্জুনপাদ প্রবর্তিত শূন্যবাদ, বা মাধ্যমিক বাদ, অপরটি হইল মৈত্রেয়, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রবর্তিত বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদ। এই দুইটি প্রসিদ্ধ মতবাদের মধ্যে যে-সকল সিদ্ধান্তগত পার্থক্য রহিয়াছে চর্যাপদগুলির মধ্যে সেই পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই—সেখানে দেখিতে পাইব, বিজ্ঞানবাদের পাশেই শূন্যবাদের অনুকূল পদ রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মহাযানের মধ্যে নাগার্জুনের শূন্যবাদ মুখ্যত নেতিবাচক—সত্য ইহা নয়, উহা নয়—তাহা নয়—, পরমার্থতত্ত্বকে সত্য বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না, তদুভয়ও বলা যায় না—অনুভয়ও বলা যায় না; তাহা আছে বলিতে পারি না—নাই-ও বলিতে পারি না—আছেও বটে নাইও বটেও বলিতে পারি না, আছে এবং নাই তাহার কোনটাই সত্য নয় তাহাও বলিতে পারি না; পরমার্থ সত্য এইভাবে চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত—এবং যে-তত্ত্ব এই চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত তাহাই হইল শূন্য। পরমার্থ সত্য সম্বন্ধে অন্বর্থকভাবে কোনও কথা বলা যায় না

বলিয়াই নাগার্জুন তাহাকে শূন্যতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদিগণ শূন্যতাকে এমন করিয়া অনস্তিবাচক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তাহার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই (বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা) শূন্যতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা আছে—কিন্তু তাহা অভূত-পরিকল্প (ন ভূত পরিকল্প অর্থাৎ হয় নাই কোনও প্রকারের মানসিক পরিকল্প যেখানে) রূপে অবস্থিত। আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়াছি, বিজ্ঞানবাদের এই অস্ত্যর্থক মতবাদের সহিত আমাদের ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের একটি নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে; অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদের 'অভূতপরিকল্প'কে বা 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা'কে আর একটু বাড়াইয়া লইলেই তাহা বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে পর্যবসিত হয়। এই কারণেই প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যকে পরবর্তী কালে অনেকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিতেন। আমরা চর্যাপদগুলির ভিতরে দেখিতে পাইব, চর্যাকারগণ বহু স্থানেই এই বিজ্ঞানবাদী মহাযান ধর্মকে অবলম্বন করিয়া একটু একটু করিয়া হিন্দু ব্রহ্মবাদে বা আত্মবাদেই গিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে; যে যুগে এই চর্যাপদগুলি রচিত সেই পাল যুগ হইল আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক হইতে একটি সর্বাঙ্গীণ সমন্বয়ের যুগ। সেই সমন্বয়ের মুখে হিন্দু-বৌদ্ধ চিন্তাও মিলিত হইয়া একটি সমন্বিত রূপ লাভ করিয়াছিল, আবার সাধনার ক্ষেত্রেও উভয় ধারার সাধনা মিলিত হইয়া একটি সমন্বিত লোকায়ত সাধনার ধারা সৃষ্টি করিয়াছিল। ধ্যান-মনন ও সাধনার দিক হইতে চর্যাপদগুলির মধ্যে যে যে উপাদান পাওয়া যায় তাহার কতটা হিন্দু এবং কতটা বৌদ্ধ তাহা পৃথক করিয়া দেখাও সর্বত্র সম্ভব নয়।

চর্যাপদগুলির মধ্যে কতগুলি পদ দেখিতে পাই, যাহা সাধারণ বৌদ্ধধর্মের চিন্তাধারা হইতেই প্রসূত। যেখানেই বলা হইয়াছে,—

ভবণই গহন গম্ভীরবগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥ (৫ নং)

তখন সমগ্র অস্তিত্ব-প্রবাহকে বৌদ্ধধর্মে যে একটি নদীপ্রবাহের সঙ্গে উপমিত করা হইয়াছে তাহারই কথা স্মরণ করি। একটি নদীপ্রবাহের মধ্যে যেমন দেখিতে পাই, প্রত্যেক মুহূর্তের প্রতিটি জলকণাই অন্য জলকণা হইতে পৃথক্— তথাপি সব জুড়িয়া একটি অখণ্ড প্রবাহের প্রতীতি হইতেছে, তেমনই আমরা যাহাকে সংসার-প্রবাহ বলি সেই প্রবাহের ভিতরকার তিনটি অস্তিত্বই ক্ষণিক এবং পৃথক—তথাপি সব জুড়িয়া আমাদের একটা অখণ্ড ভব-প্রবাহের প্রতীতি

ঘটিতেছে। দ্বিতীয় পংক্তিটির মধ্যেও আমরা প্রাচীন বৌদ্ধমতের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। বৌদ্ধমতকে সাধারণভাবেই মাধ্যমিক মত বলা হইয়া থাকে; সাধনা বিষয়ে বুদ্ধদেব প্রথমে একটা চরম কৃচ্ছ্রতার পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করিলেন যে, সাধনার পথ যেমন ভোগের পথ হওয়া উচিত নয়, তেমনি আবার চরম কৃচ্ছ্রতার পথও হওয়া উচিত নয়—মধ্যপথই হইল শ্রেয়ঃ। এখানে সেই মধ্যপথেরই ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু সেই মধ্যপথকে এখানে তান্ত্রিক মহাযানীদের মতানুরূপে রূপান্তরিত দেখিতে পাইতেছি,—গম্ভীরবেগে প্রবাহিত ভবনদীর একদিকে হইল শূন্যতা, অপরদিকে হইল করুণা,—শূন্যতা হইল জ্ঞানবাদী নিবৃত্তির দিক, করুণা হইল কুশলধর্মবাদী প্রবৃত্তির দিক—ইহার যে-কোন একটি ছাড়িয়া অপরটিকে আশ্রয় করিলেই পরম সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কাদায় গিয়া পড়িতে হইবে,—পরস্পরকে পরস্পরের সহিত অদ্বয়ভাবে যুক্ত করিয়া লইতে পারিলেই হইবে বোধিচিত্ত লাভ। শূন্যতার বা প্রজ্ঞার সহিত করুণা বা উপায়কে যুক্ত করিয়া লইলে প্রজ্ঞা আমাদিগকে আত্মকেন্দ্রিক নিবৃত্তির সঙ্কীর্ণ পথে টানিয়া লইতে পারিবে না, আবার করুণা বা উপায়ের সহিত শূন্যতা বা প্রজ্ঞাকে যুক্ত করিয়া লইতে পারিলে বোধিসত্ত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত কুশলকর্মসমূহও কখনও বন্ধনের কারণ হইতে পারে না।

প্রথম চর্যাতেই যেখানে দেখিতে পাই, 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল'—তখন আমরা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের সমবায়েই যে আমাদের দেহ এবং সেই দেহের মধ্যে যে পুদ্গলরূপী একটি অহংপ্রতীতি গড়িয়া ওঠে এই সত্যের আভাস পাই। সপ্তম চর্যায় বলা হইয়াছে,—

তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্ণু ভব পরিচ্ছিন্না॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্ণু বিমন ভইলা॥

"তাহারা তিন, তাহারা তিন,—তিনই হইল ভিন্ন। কাহ্ণু বলে (তাহা ঠিক নয়), সকলই ভব-পরিচ্ছিন্ন। যাহারা যাহারা আসিয়াছে তাহারা তাহারাই গিয়াছে—এই আসা যাওয়ায় কাহ্ণু বিমন হইল।" আমরা তিন বা বহু বলিয়া যাহা কিছু পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছি আসলে সেই সকলের কিছুই পৃথক্ স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়—শূন্যতার মধ্যেই আমরা একটা ভববোধ বা অস্তিত্ব-বোধের দ্বারা সকল কিছু পৃথক্ করিয়া পরিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেছি। যাহা

ক্ষণিকে আসে তাহাই আবার ক্ষণিকে বিনাশশীল—এই আসা যাওয়ার মধ্যে আসাটাও সত্য নয়, যাওয়াটাও সত্য নয়—ইহাই কাহ্নপাদকে বিমন করিয়া তুলিতেছে। একটা অনাদি অবিদ্যাজনিত মায়ার স্বপ্নে প্রতিভাত এই ভব-জলধি—তাহার সেই অনিত্য শূন্য স্বরূপকে বুঝিয়া লইয়াই তাহাকে হেলায় অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে—'তরিত্তা ভব-জলধি জিম করি মাঅ সুইনা'। (১৩) এই সংসার-প্রবাহের স্বরূপ এবং তাহার ভিতরে নিহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-রূপ সত্যের একটি চমৎকার বর্ণনা পাই লুইপাদের একটি পদে—

ভাব ণ হোই অভাব ণ জাই।
অইস সংবোহেঁ কো পতিআই॥
লুই ভণই বট দুলক্‌খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা॥
জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী॥
কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা॥ (২৯ নং)

"ভাবও হয় না অভাবও যায় না,—এইরূপ সংবোধের দ্বারা কে প্রতীতি লাভ করে? লুই বলিতেছে, ওহে, দুর্লক্ষ্য এই বিজ্ঞান—তিনি ধাতুতেই বিলাস করে, কিন্তু কোনও উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না। যাহার জানা যায় না কোনও বর্ণচিহ্ন-রূপ, তাহা কিরূপে আগম-বেদে হইবে ব্যাখ্যাত? কাহার সম্বন্ধে কি বলিয়া আমি দিব জিজ্ঞাসার সমাধান—জলের মধ্যে চন্দ্র যেমন সত্যও নয় মিথ্যাও নয়।" এখানে দেখিতেছি কবি মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানবাদেরই অনুসরণ করিয়াছেন। ভাব এবং অভাব—অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব—ইহার কিছুই সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়—সত্য শুধু এক দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান-স্বরূপ—যাহা সমস্ত অস্তিত্ব প্রবাহের মধ্যেই বিলাস করিতেছে—কিন্তু অভূত-পরিকল্প বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'। কিন্তু এই পদটির পাশেই আর একটি পদের উদ্ধার করা যাইতে পারে যেখানে শূন্যতাবাদিগণের ন্যায় প্রতীত্যসমুৎপাদ-হেতু প্রতিভাত সংসারের অনুৎপন্নত্ব এবং অনস্তিত্বই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—কিন্তু মিথ্যা প্রতিভাস-প্রবাহের পশ্চাতে আর কোনও প্রকারের কোনও সত্তাকেই কোনও আভাসে ইঙ্গিতেও স্বীকার করা হয় নাই।

আইএ অনুঅনাএ জগরে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে কি তা বোড়ো খাই॥

অকট জোইআরে মা কর হথা লোহা।
আইস সভাবেঁ যদি বুঝসি তুটই বাসনা তোরা॥
মরুমরীচি গন্ধর্বনঅরী দাপণ-পড়িবিম্বু জইসা।
বাতাবর্ত্তে সো দৃঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা॥
বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা।
বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশ ফুলিলা॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা আইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্গুরু-পাব॥ (৪১ সং)

"আদিতেই অনুৎপন্নহেতু এই জগৎ ভ্রান্তি দ্বারাই প্রতিভাত হয়; রজ্জু-সর্প দেখিয়া যে চমকিত হয় সত্য সত্যই কি তাহাকে ঢোঁড়াসাপে খায়? ওরে অকট (মূর্খ) যোগি; নিজের হাত লোনা করিও না,—এই স্বভাবে যদি জগৎকে বুঝিতে পার তবে টুটিবে তোমার সকল বাসনা। (এখন এই জগতের স্বরূপ বলা হইতেছে)—মরুর মরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেমন (মিথ্যা —অর্থাৎ কোনও বস্তুসত্য না থাকাতেও ভ্রান্তি-বশতঃ এবং বাসনাবশতঃ মনে প্রতিভাত), বাতাসের আবর্তে দৃঢ় হইয়া জলের মধ্যে যেমন পাথর (জলস্তম্ভাদি) প্রতিভাত হয়; বন্ধ্যাসুত যেরূপ কেলি করে—খেলে বহুবিধ খেলা,—যেমন বালুর তেল, শশকের শৃঙ্গ—আকাশের ফুল। রাউত বলিতেছে, ওহে ভুসুকু কহিতেছে,—সকলই হইল এই স্বভাব; যদি তুমি মূঢ় হইয়া থাক—তবে জিজ্ঞাসা কর নিজের সব ভ্রান্তি—সদ্গুরুর পায়ে।" এখানে দেখিতেছি, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যেমন দেখিতে পাই, আমাদের বহু বস্তুজ্ঞান আছে—অথচ তাহাদের পশ্চাতে কোনরূপ বস্তুসত্য থাকাই সম্ভব নয়, সেখানে যেমন চিত্তবিকল্পের দ্বারাই কিছু না হইতেই আমরা অনেক কিছু গড়িয়া লই—জগৎ-সংসারের সমগ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সেই এক কথা সত্য—ইহা অনাদি অবিদ্যাজাত একটা চিত্ত-বিকল্পের প্রতীতিমাত্র—আসলে সবই একটি প্রকাণ্ড নিরধিষ্ঠান ভ্রম। কিন্তু এই পদটির পাশেই আমরা কাহ্ন পাদের একটি পদ উদ্ধৃত করিতে পারি—যে পদের মধ্যে অভূত-পরিকল্প বিজ্ঞান মহাসুখ-স্বরূপে একটা সর্বব্যাপী শাশ্বত আনন্দ-স্বরূপে দেখা দিয়াছে—এবং সেই মহাসুখ-স্বরূপ বিজ্ঞান বেদান্তের আনন্দ-স্বরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সহিত মনের অজ্ঞাতে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥

ভণ কইসে কাহ্ন নাহি।
করই অনুদিন তৈলোএ পমাই ॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ তরঙ্গ কি সোসই সাঅর ॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ মাঝে লড় অচ্ছন্তে ন দেখই ॥
ভব জাই ণ আবই এথু কোই।
আইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই ॥ (৪২)

"চিত্ত সহজের দ্বারা (মহাসুখ-রূপ সহজ-স্বরূপে) শূন্য-সম্পূর্ণ (শূন্য হইয়াই সম্পূর্ণ); স্কন্ধবিয়োগে বিষণ্ণ হইও না। বল, কি করিয়া কাহ্নু নাই—? অনুদিন ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া স্ফূর্তি লাভ করিতেছে (মূঢ়গণই দৃষ্টকে নষ্ট দেখিয়া কাতর হয় ; তরঙ্গ-ভঙ্গ কি সাগরকে শোষণ করে ? আছে যে লোক, মূঢ়েরা তাহাকেও দেখিতে পায় না, দুধের মধ্যে যেমন স্নেহ পদার্থ থাকিলেও দেখিতে পায় না। এখানে কোনও অস্তিত্ব আসেও না—যায়ও না,—এই ভাবেই বিলাস করিতেছে কাহ্নিল যোগী।" এখানে দেখিতেছি শূন্যতা ত শূন্যতা নয়, তাহা পূর্ণতারই নামান্তর। মৃত্যুতে সব শেষ নয়—মৃত্যু ত স্থূল দেহের অবসান—পঞ্চস্কন্ধের বিয়োগ মাত্র ; এই স্কন্ধ-বিয়োগের পরেও কি থাকে ? থাকে আমাদের আনন্দময় সহজ-স্বরূপ ; সেই আনন্দময় সহজ-স্বরূপ আসলে একটা আনন্দময় সর্বব্যাপী শাশ্বত অস্তিত্ব। সেই সর্বব্যাপী আনন্দময় অস্তিত্ব যেন একটি সাগর, প্রতিটি ব্যক্তিজীবন তাহাতে এক একটি ঢেউ। ঢেউ-এর ওঠা-পড়ায় যেমন সাগরের কোনও ভাব-অভাব সূচিত হয় না, তেমনই এক আনন্দময় অস্তিত্বের মহাসাগরে অবিদ্যাবিক্ষুব্ধ যে এই ব্যক্তি-জীবনের ঢেউ তাহা দ্বারা সেই মহাসাগরে কোনরূপ পরিবর্তনই সূচিত হয় না। স্কন্ধ-বিয়োগের পরে যে আমাদের এক অখণ্ড আনন্দস্বরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া তিনলোকব্যাপী আনন্দের বিলাস—স্থূলদৃষ্টিতে ত তাহাকে দেখিবার বুঝিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন—প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সেই আনন্দময় অস্তিত্বকে অনুভব করিতে পারে। এই যে সহজানন্দস্বরূপ শূন্য-স্বরূপ—অনিত্য সংসারের ভিতরে ইহাই একমাত্র আপনার বস্তু। তাই সহরপাদ গাহিয়াছেন,—

অদভুঅ ভবমোহরে দিসই পর অপ্পণা।
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুণ অপণা ॥ (৩৯)

অদ্ভুত এই ভবমোহ—তাহাই দেখায় যত পর ও আপন; এই জলবিম্বাকার রূপ জগতে সহজে প্রতিষ্ঠিত শূন্য-স্বরূপই আত্ম-স্বরূপ—তাহাই শুধু আপনার।

মতবাদের অন্যান্য অমিল সত্ত্বেও নাগার্জুনের শূন্যবাদ এবং মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদের মধ্যে এইখানে ঐকমত্য রহিয়াছে যে, বস্তু-জগতের যেমন কোনও পারমার্থিক সত্তা নাই, তেমনই মনোধর্ম এবং সেই মনোধর্ম হইতে উদ্ভূত আত্মবোধ বা পুদ্গল-বোধেরও কোন পরমার্থিক সত্তা নাই। বস্তুর অসারত্বকে সাধারণতঃ ধর্মনৈরাত্ম্য এবং আত্মবোধের অসারত্বকে পুদ্গল-নৈরাত্ম্য বলা হইয়া থাকে; এই উভয়বিধ নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকাই হইল শূন্যতায় প্রতিষ্ঠা। ইহার ভিতরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্বস্তু সম্বন্ধে ইঁহাদের মত হইল যে, বহির্বস্তু সবটাই হইল অবিদ্যাক্ষুব্ধ চিত্তচৈতসিকের সৃষ্টি। শূন্যবাদী-দের মতে সম্পূর্ণ কিছু না হইতেই জগৎ-সংসারে সব কিছু গড়িয়া লয়; অনাদি-অবিদ্যায় ধৃত অনাদি বাসনারই বহিঃপ্রকাশ বিচিত্র বস্তুরূপে। বিজ্ঞান-বাদীরা বলিবেন, ব্যক্তি-বিজ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ বস্তুরূপে, আর এই ব্যক্তি-বিজ্ঞান বিধৃত আছে একটি সমষ্টি-বিজ্ঞানে—বিজ্ঞানবাদীরা ইহার নাম দিয়াছেন আলয়-বিজ্ঞান। বিজ্ঞানই অবিদ্যা দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া একদিকে চিত্ত-চৈতসিক-রূপে নিজেকে ছড়াইয়া দেয়—আর এই চঞ্চল চিত্তবৃত্তিই আবার কাল-জ্ঞান এবং দেশ-জ্ঞান সৃষ্টি করিয়া বস্তুজ্ঞান সম্ভব করিয়া তোলে। এইজন্যই লুইপাদ বলিয়াছেন,—'চঞ্চল চীএ পইঠা কাল'। কালজ্ঞান আমাদের সকল বস্তুজ্ঞানের মূলে—সব বস্তুর অস্তিত্বই ত কালে, কালের বোধ না থাকিলে বস্তু সম্বন্ধে বোধ সম্ভব হইবে কিরূপে? সকল প্রকার অস্তিত্ববোধের মূলীভূত যে কাল তাহা ত কোনও বহির্বস্তু নহে—চিত্তের চাঞ্চল্যের জন্য চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে সন্ততি-বোধ তাহাই কালবোধকে সম্ভব করিয়া তোলে,—সুতরাং কাল হইল সম্পূর্ণ ই চৈত্তিক বা চৈতসিক। অবিদ্যাজনিত বাসনাবিক্ষোভ নিরুদ্ধ হইলেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই কাল নিরুদ্ধ হয়—কাল-নিরুদ্ধ হইলেই বস্তুজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় এবং ধর্মনৈরাত্ম্য এবং পুদ্গল-নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা—অর্থাৎ শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয়।

বৌদ্ধ দর্শনের এই চিত্ত-প্রাধান্যবাদের (Idealism) দ্বারা চর্যাকারগণ গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন এবং নানা রূপকের সাহায্যে সংসারে চিত্তের খেলা এবং চিত্ত-নিরোধের প্রয়োজন ও পন্থা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটি পদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, চিত্তের জাল বিস্তার করিয়া করিয়া আমরা বস্তুজাল রচনা করিতেছি—এবং এই চিত্তজাল এবং তদ্-রচিত

বন্ধজালের মধ্যে নিজেরাই নিজেদের বন্ধনগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছি। ভব ও নির্বাণ—অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব—ইহার দুইটিই আমরা আমাদের মনের দ্বারা সৃষ্টি করিয়া লই—আসলে জন্মও মিথ্যা—মৃত্যুও মিথ্যা—তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে জন্ম এবং মৃত্যু এই উভয়ের মধ্যে কোনও রকমেরই কোনও পার্থক্য বোধ হয় না,—কারণ দুই মিথ্যার মধ্যে আবার পার্থক্য-বোধের সম্ভাবনা কোথায়? যাহারা জন্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে তাহারাই মৃত্যুর চিন্তায় ভীত হয়; জন্মকেই যদি আদিতে ভ্রান্তি বলিয়া প্রত্যয় জন্মিল তবে আর মৃত্যুভয় কোথায়—এবং মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চেষ্টাদির প্রয়োজন কি? কেহ বলেন কর্মের দ্বারা জন্ম হয়, কেহ বলেন জন্মের দ্বারা কর্ম হয়—চর্যাকারগণ বলিবেন জন্ম ও কর্ম উভয়ই বাসনা-বিক্ষোভজনিত ভ্রান্তিরই বিলাপ।

এই তত্ত্বটিই প্রকাশ পাইয়াছে সরহপাদের একটি সুন্দর পদে—

অপণে রচি রচি ভব-নির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥
অম্হে ণ জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসে জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো॥
* * * *
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণন্তি অচিন্ত সো ধাম॥ (২২ সং)

"আপনি রচিয়া রচিয়া ভব-নির্বাণ মিথ্যাই লোক নিজেকে বাঁধায়। অচিন্ত্যযোগী আমরা জানি না কি করিয়া জন্ম মরণ ও ভব (অস্তিত্ব) হয়। যেরূপ জন্ম, মরণও সেইরূপ; জীবন্তে ও মৃতাবস্থায় নাহি কোনও বিশেষ।...জন্মে কর্ম কি কর্মে জন্ম—সরহ বলে, অচিন্ত্য সেই ধাম।"

এই চিত্তের দুইটি রূপ রহিয়াছে, একটি হইল সর্ববিধ দোষগ্রস্ত অপরিশুদ্ধ রূপ—এই মায়াবচ্ছিন্ন যে অপরিশুদ্ধ বিজ্ঞান ইহাই হইল বদ্ধজীব। চিত্ত যেখানে বিশুদ্ধবিজ্ঞান সেখানে সে প্রজ্ঞালোকে দীপ্ত—সেখানে সে 'প্রকৃতি-প্রভাস্বর'—অর্থাৎ প্রকৃতিতেই জ্যোতিঃস্বরূপ। এই প্রকৃতি-প্রভাস্বর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানই আমাদের আনন্দময় সহজস্বরূপ—ইহাই সহজানন্দদায়িনী বা মহাসুখদায়িনী শূন্যতা। চিত্তের এই দুই অবস্থার কথা স্নিগ্ধ করুণরসের পরিবেশনের সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন ভুসুকুপাদ তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ পদে

(৬নং)। নিজেকে ভুসুকুপাদ এখানে কল্পনা করিয়াছেন একটি অবোধ হরিণের সঙ্গে—যে আশ-পাশের কোন খবর না রাখিয়া আনন্দে বিহার করে বনভূমিতে। সহসা একদিন সে সচেতন হইয়া ওঠে চারিদিকে বেড়িয়া-ধরা হাঁক-ডাক-দেওয়া ব্যাধের সম্বন্ধে; বুঝিতে পারে, সে নিজের চারিদিকে নিজেই যেন ডাকিয়া আনিয়াছে কত বৈরী। তখন আসে তাহার বৈরাগ্য—আত্মচিন্তন—ছোঁয় না সে আর তৃণ—পান করে না জল—মনে পড়িয়া যায় তাহার আপনজন হরিণীকে—সুপরিশুদ্ধা প্রকৃতি-প্রভাস্বরা মহাসুখরূপা শূন্যতারূপিণীকে—তাহার সহজ-স্বরূপকে। তখন চলিতে থাকে চিত্তশুদ্ধির সাধনা—সেই সাধনার ফলে একদিন আসিয়া দেখা দেয় হরিণী—নিজের মধ্যেই অনুভূত হয় সেই সহজ-স্বরূপ—প্রকৃতি-প্রভাস্বরা শূন্যতা,—সে বলে এই সংসার-অরণ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে। সেই প্রজ্ঞার আহ্বানে সাড়া দেয় বদ্ধজীব হরিণ—তীব্র গতিতে চলে তাহার ঊর্ধ্বায়ন—আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহার সন্ধান।

ভুসুকুপাদেরই অন্য একটি পদে এই চঞ্চল চিত্তকে উপমিত করা হইয়াছে একটি চঞ্চল মূষিকের সঙ্গে।—

নিসি অন্ধারী মুসা আচারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ অহারা॥
মাররে জোইআ মুসা-পবণা।
জেন তুটঅ অবণা-গবণা॥
ভব বিন্দারঅ মুসা খনঅ গাতি।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী॥
কাল মুসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি করঅ অমিঅ পাণ॥
তাব সে মুসা উঞ্চল পাঞ্চল।
সদ্‌গুরুবোহে করহ সো নিচ্চল॥
জবেঁ মুসাএর অচার তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ॥ (২১ সং)

"নিশি অন্ধকার—মূষিকের চরণ (আনাগোনা, সক্রিয়তা); অমৃত ভক্ষণ করে মূষিক—করে (সব) আহার। হে যোগি, মার এই মূষিক-পবনকে,—যাহাতে টুটিয়া যাইবে আসা-যাওয়া। ভব-বিদারক মূষিক—খনন করে গর্ত; চঞ্চল মূষিককে ভাল করিয়া বুঝিয়া (যোগিগণ) তাহার নাশক হইয়া থাকে। কাল মূষিক—উদ্দেশও নাই বর্ণও নাই; গগনে উঠিয়া করে অমৃত পান। সেই

পর্যন্ত থাকে মূষিক উচল-পাঁচল, সদ্‌গুরুর বোধের দ্বারা (উপদেশ দ্বারা) তাহাকে কর নিশ্চল। যখন মূষিকের আচার (আচরণ, সক্রিয়তা) টোটে, ভুসুকু বলে, তবে বন্ধন খসিয়া যায়।" চঞ্চল মূষিকের আনাগোনা রাত্রির অন্ধকারে। এই চঞ্চলচিত্ত নষ্ট করিয়া দেয় দেহাগারে অবস্থিত সকল অমৃত। পবনই হইল চিত্তমূষিক—কারণ যোগমতে শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ুই হইল চিত্তের বাহন। বায়ু-স্থৈর্য দ্বারাই চিত্তস্থৈর্য—চিত্তস্থৈর্য দ্বারাই ভবচক্রের নিরোধ। চঞ্চল চিত্ত-মূষিকই হইল ভব-বিস্তারক (বিদারক কথাটি এখানে বিস্তারক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়)—সকল অস্তিত্বজ্ঞানের প্রসারক—ইহাই খনন করে আমাদের পতনের জন্ত যত গর্ত। কিন্তু যখন ইহাকে গগনাভিমুখে অর্থাৎ শূন্যতাভিমুখে উর্ধ্বে তোলা যায়—তখন মহাসুখ-কমলে এই মূষিক পান করে বোধিচিত্তরূপ চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত, তখন চঞ্চল মূষিকই দেখা দেয় স্থির এবং প্রকৃতি-প্রভাস্বররূপে।

অপর একটি পদে মনকে উপমিত করা হইয়াছে একটি ক্রম-বর্ধিষ্ণু বৃক্ষের সঙ্গে। (৪৫ সং) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই হইল এই মনতরুর পাঁচটি শাখা—আর বহুল আশাই হইল পত্রফলবাহক। মূলে নিত্য জলসিঞ্চিত হইলে যেমন তরু বাড়িয়া ওঠে—শুভাশুভের কল্পনা দ্বারাই তেমনই মন-তরু রসসঞ্চয় করিয়া ওঠে। এই মনতরুকে ছেদনই হইল সাধকের বড় কাজ,—সদ্‌গুরুর নিকট হইতে উপদেশ লইয়া পরিপূর্ণ প্রজ্ঞারূপ কুঠারের দ্বারা—(অর্থাৎ চিত্তের বিশুদ্ধ প্রভাস্বর-স্বরূপের দ্বারাই) এই মনতরুকে মূল-ডালসহ কাটিয়া ফেলিতে হয়—অর্থাৎ মনকে নির্বীজভাবে নিরুদ্ধ করিতে হয়।

জয়নন্দীপাদ তাঁহার একটি পদেও চিত্তের এই দুই অবস্থার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন।

পেখু সুইনে অদশ জইসা।
অন্তরালে মোহ তইসা॥
মোহবিমুক্কা জই মনা।
তবেঁ তুটই অবণাগমনা॥
নউ দাঢ়ই নউ তিমই ন চ্ছিজই।
পেখ লোঅ মোহে বলি বলি বাঝই॥
ছাঅ মাআ কাঅ সমানা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণাণা॥
চিঅ তথতা-স্বভাবে সোহই।
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ন হোই॥ (৪৬ সং)

"দেখ, স্বপ্নে আদর্শে (আয়নায়) যেরূপ, অন্তরালে মোহ সেইরূপ। মোহবিমুক্ত যদি মন, তবে টুটে আসা-যাওয়া। (তখন মোহশূন্য প্রভাস্বর চিত্ত) দগ্ধ হয় না, ভেজে না, ছিন্ন হয় না,—(তথাপি) দেখ লোক মোহে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। ছায়া মায়া কায়া সমান—দুইপক্ষে সেই বিজ্ঞান। চিত্ত তথতা-স্বভাবে শোভা পায়—জয়নন্দী বলে, তখন সবই স্ফুট (পরিষ্কার)—অন্য কিছু নাই।"

মনের ভিতরে যে মোহ থাকে তাহার কাজ কি? স্বপ্নে যেমন কিছু ঘটিতেছে না—তবু অনেক কিছু ঘটিতেছে দেখা যায়, আয়নার মধ্যে যেমন কিছু নাই—তথাপি অনেক কিছু দেখা যায়, তেমনই মনের মোহ মিথ্যার মধ্যেই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া লয়। এই যে মোহগ্রস্ত মন তাহাই হইল অপরিশুদ্ধ চিত্ত—এই চিত্ত মোহবিমুক্ত হইয়া পরিশুদ্ধ হইলেই ভব-চক্র থামিয়া যায়—আসা-যাওয়ার প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়। তখনকার সেই মোহহীন পরিশুদ্ধ যে প্রভাস্বর চিত্ত তাহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-স্বরূপ—তাহা সর্বগত অদ্বয় বিজ্ঞানেরই বিশেষ প্রকাশ—তাহা অদাহ্য, অক্লেদ্য, অচ্ছেদ্য। বিজ্ঞানের মধ্যে যেখানে গ্রাহ্যত্ব এবং গ্রাহকত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব এবং জ্ঞাতৃস্বরূপ দ্বৈতত্ব—সেইখানেই একই বিজ্ঞান হইতে কত ছায়া-মায়া-কায়ার উৎপত্তি, কিন্তু চিত্ত যেখানে তথতা-স্বভাবে বা বিশুদ্ধ অদ্বয় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে শুধু প্রভাস্বর চিত্তেরই প্রকাশ—আর কোথাও কিছু নাই। এই প্রভাস্বর চিত্তই হইল মহাসুখময় সহজ-স্বরূপ।

ধ্যান-বিচার ও যোগসাধনার সাহায্যে সাধকগণ এই অবিদ্যা-বিত্তকে যে কি করিয়া বিনাশ করিতেন অনেক পদের মধ্যে তাহার আভাস রহিয়াছে। শান্তিপাদ তাঁহার একটি পদে বলিয়াছেন,—

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু॥
তউসে হেরুঅ ন পাবিঅই।
শান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই॥
তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ।
শূন লইআঁ অপণা চটারিউ॥ (২৬ সং)

"তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ আঁশ করিলাম, আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া নিরবয়ব শেষ। তথাপি হেতুরূপ পাওয়া গেল না, শান্তি বলে, কেন আর ভাবা হইতেছে! তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্যে গ্রহণ করিলাম—শূন্যকে লইয়া নিজেকেও উৎপাটিত করিলাম।" এখানে তুলা হইল চিত্ত তুলা—তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া শেষ করিয়া দেখিলেও তাহার ভিতরে বস্তুনির্মাণের জগৎ-

প্রতিভাসের হেতুরূপ যাহা তাহা আর বোঝা গেল না। আসলে এই হেতুরূপটি চিত্তের স্বধর্ম নয়, ইহা অবিদ্যাশ্রিত আগন্তুক ধর্ম। তাই চিত্তকে বিচার-বিশ্লেষণ—ধ্যান-ধারণার ভিতর দিয়া যখন বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়—তখন বোঝা যায়, ভাব্য-ভাবক সবই মিথ্যা। চিত্তকে ধুনিয়া ধুনিয়া তাহাকে দিতে হয় শূন্যে বিলীন করিয়া—চিত্ত শূন্যে বিলীন হইলেই সকল অহং-প্রত্যয়ও নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়—শুধু একটা স্বসংবেদ্য মহাসুখ-স্বরূপতা ব্যতীত তখন আর অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এই চিত্ত-বিনাশ সম্বন্ধে ভাদেপাদ বলিয়াছেন—

এতকাল হাউ অচ্ছিলেঁ। স্বমোহে।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ।
এবেঁ চিঅরাঅ মকু ণঠা
গঅণ-সমুদে টলিআ পইঠা॥
পেখমি দহদিহ সব্বই শূন।
চিঅ বিহূনে পাপ ন পুন্ন॥
বাজুলে দিল মো লকৃখ ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পসিয়া॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ।
চিঅরাঅ মই অহার কএলা॥ (৩৫ সং)

"এতকাল আমি ছিলাম স্বমোহে, এখন আমি (সব) বুঝিলাম সদ্‌গুরুর বোধে। এখন আমার (অবিদ্যাক্লিষ্ট) চিত্তরাজ নষ্ট (নিঃস্বভাবীকৃত) হইয়া গিয়াছে—গগন-সমুদ্রে টলিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। (এখন) দেখিতেছি দশদিক্ সবই শূন্য, চিত্ত বিহনে পাপও নাই. পুণ্যও নাই। বজ্রগুরু আমাকে লক্ষ্য বলিয়া দিয়াছেন, আমি আহার করিয়াছি (নিঃস্বভাবীকৃত করিয়াছি) গগনে প্রবেশ করিয়া। ভাদে বলে, অভাগকে (যাহার আর ভাগ হয় না—অদ্বয় সত্যকে) লইয়া চিত্তরাজকে আমি আহার করিয়াছি। এখানে গগন সমুদ্র হইল শূন্যতারূপ পরমপ্রজ্ঞা ; চন্দ্র যেমন সমুদ্রে টলিয়া পড়িলে সব অন্ধকার হইয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবোধও সব নিরস্ত হইয়া যায়—চিত্ত-চন্দ্র শূন্যতা-সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেও সেইরূপ সকল বিষয়বোধ নিরস্ত হইয়া যায়—সাধক এক অদ্বয়বোধেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এ বিষয়ে আর্যদেবপাদও বলিয়াছেন,—

জহি মণ ইন্দ্রিঅ-পবণ হো ণঠা।
ণ জানমি অপা কহিঁ গই পইঠা॥

... ...

চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসই।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই ॥ (৩১ সং)

"যেখানে মন ইন্দ্রিয় পবন হয় নষ্ট, (তখন) আমি জানি না নিজে কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট হই।...চন্দ্র চন্দ্রকান্তিকে যেমন প্রতিভাসিত করে,—চিত্ত-বিকরণে (নিঃস্বভাবীকরণে) তাহার মধ্যেই (সব) টলিয়া প্রবেশ করে।" অর্থাৎ চন্দ্র না থাকিলে যেমন চন্দ্রকান্তি বাহ্যজগৎকে প্রতিভাত করিয়া তুলিতে পারে না, তেমনই চিত্ত না থাকিলে চৈতসিক বিকল্পাদিও আর বস্তুজগৎকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে না।

মনে রাখিতে হইবে, অবিদ্যা-চিত্তকে বিনাশ করার অর্থ ই হইল তাহাকে প্রকৃতি-প্রভাস্বর করিয়া তোলা। মহাসুখের অনুভূতিতে মত্ত সাধকের প্রভাস্বর চিত্তকে অনেক সময় মদমত্ত হস্তীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কাহ্নপাদের একটি পদে বলা হইয়াছে, একটি মদমত্ত হস্তী যেমন তাহাকে যে-সকল থামের সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়—যে-সকল বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হয় সব ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া পদ্ম বনে গিয়া প্রবেশ করে এবং স্বচ্ছন্দে বিলাস করে, তাঁহার মহাসুখরূপ-আসবে মত্ত প্রভাস্বর চিত্তও তেমনই গ্রাহ্য-গ্রাহকদ্বয়ের দুই থাম মর্দিত করিয়া বিবিধ ব্যাপক বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সহজ-নলিনী-বনে প্রবেশ করিয়া বিলাস করিতেছে।

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ ॥
কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ (৯ সং)

চিত্তগজেন্দ্রের এই অবস্থার বর্ণনায় মহীধরপাদ বলিয়াছেন,—

মাতেল চীঅ-গএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥
পাপ পুণ্ন বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠানা।
গঅণ-টাকলি লাগিরে চিত্ত পইঠ নিবাণা ॥
মহারসপানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।
পঞ্চ-বিসঅ-নায়ক রে বিপখ কোবি ন দেখি ॥
খররবি-কিরণ সন্তাপেঁ রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।
ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তেকিম্পি ন দিঠা ॥ (১৬ সং)

"মত্ত আমার চিত্ত-গজেন্দ্র ধাবিত হইতেছে—নিরন্তর গগনে (শূন্যতা-বোধে) সর্বপ্রকার দ্বৈতত্বকে ঘোলাইয়া দিতেছে। পাপ-পুণ্যের দুই শিকল ছিঁড়িয়া, স্তম্ভস্থানকে মর্দিত করিয়া গগন-শিখরে (শূন্যতার শেষ স্তরে) পৌঁছিয়া চিত্ত নির্বাণে প্রবিষ্ট হইল। ত্রিভুবনের সকল কিছু উপেক্ষা করিয়া সে মহারসপানে মাতিল,—(এখন সে) পঞ্চ-বিষয়ের নায়ক—তাহার পক্ষে কাহাকেও দেখি না। (মহাসুখানুভূতিরূপ) খররবি সন্তাপে সে গগনাঙ্গনে (শূন্যতায়) গিয়া পৌঁছিয়াছে; মহীধরপাদ বলিতেছেন, আমি যখন ইহার মধ্যে ডুবিয়া যাই তখন আর কিছুই দেখিতে পাই না।"

এই যে সর্বসংকল্প-বিকল্প বর্জিত প্রভাস্বর চিত্ত ইহাই প্রজ্ঞাস্বরূপ, ইহাই শূন্যতা, এবং শূন্যতাই হইল সাধক-জীবনের 'সোনা'—আর অবিদ্যাচিত্তজাত যে রূপ-জগৎ তাহাই হইল রূপা। তাহাই কম্বলাম্বরপাদ চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন একটি পদে—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥ (৮ সং)

"শূন্যতারূপ সোনা দ্বারা ভরিয়া লইয়াছি আমার করুণার নৌকা, 'রূপে'র রূপা রাখিব এমন আর ঠাঁই নাই।"

আমার বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে একটি চতুঃশূন্যের মতবাদ দেখিতে পাই, নাগার্জুনপাদের নামে প্রচলিত 'পঞ্চক্রম' নামক তান্ত্রিকগ্রন্থে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাই। এই চতুঃশূন্য হইল শূন্যতারূপ প্রজ্ঞার স্তরভেদ লইয়া চিত্তেরই চারিটি স্তরভেদ। প্রথম স্তর হইল শূন্য,—এই স্তরে চিত্ত প্রজ্ঞা বা আলোকোন্মুখী বটে, কিন্তু এই স্তরেও চিত্তের সহিত অবিশুদ্ধির কারণ-স্বরূপ শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা, সমবেদনা, প্রত্যবেক্ষা, কারুণ্য প্রভৃতি তেত্রিশ প্রকারের প্রকৃতিদোষ জড়িত থাকে। দ্বিতীয় স্তর হইল অতিশূন্য, ইহা প্রথম স্তর হইতেই উদ্ভূত হয়; ইহার সহিত কাম, সন্তোষ, সুখ, বিস্ময়, ধৈর্য, গর্ব, প্রভৃতি চল্লিশটি প্রকৃতিদোষ যুক্ত থাকে। তৃতীয় স্তর হইল মহাশূন্য ইহা অপর দুই শূন্য হইতে বিশুদ্ধতর এবং উর্ধ্বের হইলেও ইহার সহিত বিস্মৃতি, ভ্রান্তি, আলস্য প্রভৃতি সাতটি প্রকৃতিদোষ যুক্ত থাকে। এই প্রকৃতি দোষ সকল আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত দিনরাত্রই প্রবাহিত হইতে থাকে। চতুর্থ স্তর হইল সর্বশূন্য—ইহা সর্বপ্রকারের প্রকৃতিদোষ-রহিত এবং ইহা প্রকৃতি-প্রভাস্বর অর্থাৎ আত্মপ্রকৃতি বা আত্ম-স্বরূপেই প্রভাস্বর। ইহা হইল পরম বিশুদ্ধ, পরম সত্য—পরম বিজ্ঞান। ইহা

আদি বা অনাদি নয়, মধ্য বা অমধ্য নয়—অন্ত বা অনন্ত নয় ; ইহা অস্তি-নাস্তি, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি সকলের উর্ধ্বে।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের দোহা এবং চর্যাগীতির মধ্যে এই চারিশূন্যের তত্ত্ব নানাভাবে গৃহীত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কাহ্নপাদ একটি দোহায় বলিয়াছেন,—'পত্ত চউটঠ চউ-মৃণাল ঠিঅ মহাসুহ বাসে'—মহা-সুখের আবাসে চারিটি পত্র এবং চারিটি মৃণাল রহিয়াছে। এই চারিটি পত্র হইল পূর্ব-ব্যাখ্যাত চতুঃশূন্য। চর্যাপদের মধ্যে ঢেণ্ঢণপাদের একটি পদ রহিয়াছে,—

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

... ...

বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে॥
পিটা দুহিএ তিনা সাঁঝে॥ (৩৩ সং)

"উঁচুতে (টিলাতে) আমার ঘর, নাই কোনও প্রতিবেশী ; হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্য আসে।...বলদ বিয়াইল, গাভী বন্ধ্যা ; পিঠ দোহা হয় এ তিন সন্ধ্যা।" চর্যাপদের মুনিদত্ত কৃত যে টীকা রহিয়াছে—তাহা অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিলে, এখানে হাঁড়ির ভাত হইল পূর্বোক্ত প্রকৃতিদোষ সমূহ। এই প্রকৃতি-দোষ সব চলিয়া গেলে উষ্ণীষকমলে বা মহাসুখচক্রে (উঁচু টিলায়) সাধকের বাস হয় এবং চন্দ্র-সূর্যরূপ প্রতিবেশী (গ্রাহ্য-গ্রাহকস্বরূপ দ্বৈতত্ব) চলিয়া যায়। ত্রিবিধ প্রকৃতিদোষ (ভাসত্রয়) যুক্ত যে-চিত্ত তাহাই হইল 'বলদ'—তাহাই বিয়ায়—অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চের পরিকল্পনা করে, চতুর্থশূন্য বা সর্বশূন্য রূপ যে গাভী তাহাই হইল বন্ধ্যা—সেখানে আর কোনও ভব-বিকল্পের সম্ভাবনা নাই। যোগী সর্বদাই তাই 'পীঠ' বা এই ত্রিবিধ প্রকৃতিদোষকে দোহন করিবার চেষ্টা করেন। দারিকপাদ একটি পদে বলিয়াছেন,—'বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ'—'দারিক গগনের অপরকূলে বিলাস করিতেছেন'। এখানে গগন অর্থ শূন্য, গগনের অপরকূলে অর্থ হইল প্রকৃতিদোষযুক্ত ত্রিশূন্যের অপরকূলে—অর্থাৎ সর্বশূন্যরূপ প্রভাস্বর মহাসুখে। কাহ্নপাদ একটি পদে বলিয়াছেন,—

সুণ বাহ তথতা পহারী।
মোহ ভণ্ডার লই সঅলা অহারী॥
ঘুমই ন চেবই সপরবিভাগা।
সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা॥

চেঅণ ন বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা॥ (৩৬ সং)

"শূন্যবাহুতে তথতা প্রহার করিয়া মোহ-ভাণ্ডার লইলাম সকলই আহার করিয়া (নিঃশেষে হরণ করিয়া)। (এখন) ঘুমায় না, জাগেও না, আত্ম-পর-বিভাগও নাই; সহজে নিদ্রালু 'লাঙ্গা যোগী' কাহ্ন। চেতনাও নাই—বেদনাও নাই—গভীরে নিদ্রা গেল; সকল সুফল করিয়া সুখে শুইল।" এখানে দেখিতেছি, 'শূন্যের নিকটেই আছে মোহভাণ্ডার, সেই মোহভাণ্ডারকে লুঠ করিয়া লইতে প্রথমে তাই শূন্যের বাহুতেই কঠিন আঘাত করিতে হইল। এই শূন্য হইল পূর্ববর্ণিত প্রথম তিন শূন্য, আর এই তিন শূন্যের আশ্রিত প্রকৃতি-দোষই হইল মোহভাণ্ডার। সর্বশূন্যরূপ চতুর্থ শূন্য হইল তথতা; এই 'তথতা'ই হইল পারমার্থিক অদ্বয় সত্তা—সেই 'তথতা' বা পরমবিশুদ্ধ চতুর্থ শূন্যের দ্বারা প্রথম শূন্যকে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে ঘায়েল করিতে পারিলেই সকল প্রকৃতিদোষ চলিয়া যায়। প্রকৃতিদোষ নিঃশেষে চলিয়া গেলে সাধকের যে অবস্থা হয় কাহ্নপাদ পরবর্তী পদগুলিতে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। কাহ্ন-পাদ আর একটি পদে দাবাখেলার রূপকে সাধনার বর্ণনা করিয়াছেন; সেখানে বলিয়াছেন,—

ফীটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর।
উআরি উএসে কহ্ন নিঅড় জিনউর॥
পহিলে তোড়িআ বড়িয়া মারিউ।
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥ (১২ সং)

"দুই ক্ষীটিত—নিঃস্বভাবীকৃত হইল, ঠাকুরও মৃত হইলে; উপকারিক (গুরু) উপদেশে কাহ্ন (দেখিল) নিকটেই জিনপুর। প্রথমে তোড়িয়া বড়ি-কাকে মারিলাম, গজবরকে তোড়িয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম।" এখানে প্রথমে যে 'দুই'য়ের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল 'শূন্য' ও 'অতিশূন্য' রূপ প্রকৃতি-দোষযুক্ত আভাস-দ্বয়; 'ঠাকুর' হইল তৃতীয়-শূন্যরূপ অবিদ্যাচিত্ত; এই তিনশূন্যই ক্রমে বিনষ্ট হইলে উপকারিক গুরুর উপদেশে নিকটেই দেখা দেয় মহাসুখময় পরমধাম। দ্বিতীয় পংক্তিতে যে বড়িকার ('বড়ে') কথা বলা হইয়াছে টীকায় এই বড়িকার অর্থ করা হইয়াছে 'ষড়ুত্তরশত প্রকৃতিদোষ'। আমরা দেখিয়াছি, প্রথম শূন্যের সহিত তেত্রিশ প্রকারের প্রকৃতিদোষ থাকে, দ্বিতীয় অতিশূন্যের সহিত থাকে চল্লিশটি প্রকৃতিদোষ, আর তৃতীয় মহাশূন্যের সহিত থাকে সাতটি; এই মোট আশীটি; ইহা আবার দিন ও রাত্রি ভেদে

দ্বিগুণ—তাই প্রকৃতিদোষের মোট সংখ্যা হইল একশত ষাটটি। ইহা নিঃশেষে বিনষ্ট হইলে তখন বাকি থাকে যে গজবর তাহাই হইল সর্বশূন্যরূপে তথতা-চিত্ত, পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়ে জাগিয়া ওঠে যে অহঙ্কার-মমাকারাদি প্রত্যয় সেই তথতা-চিত্তকে দিয়াই তাহাকেও দূর করিয়া সহজ-স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়। শবরপাদের একটি পদে দেখি,—

> গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিঁএঁ কুরাড়ী।
> কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী॥
> ... ...
> তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা।
> ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিআ॥ (৫০ সং)

"গগনে গগনে তল্লগ্ন বাড়ী, কুঠারের দ্বারা তাহাকে ছিন্ন করা হইল, কণ্ঠে নৈরামণি বালিকা জাগিয়া উঠিলে হয় গৃহীত।...তল্লগ্ন বাড়ীর পাশে জ্যোৎস্না বাড়ী উদিত হইল, আকাশের কুসুমের মতন অন্ধকার গেল দূর হইয়া।" এখানে প্রথম গগন হইল শূন্য, দ্বিতীয় গগন অতিশূন্য—এবং তল্লগ্ন বাড়ী হইল তৃতীয় মহাশূন্য; এই তিনকেই তথতা-চিত্ত রূপ চতুর্থশূন্যের কুঠার দ্বারা বিনষ্ট করিতে হইবে, তাহা হইলেই সহজানন্দরূপিণী নৈরোমণি (নৈরাত্মা) কণ্ঠে অর্থাৎ সম্ভোগচক্রে জাগ্রত হয়,—অর্থাৎ তখন এই সহজানন্দের অনুভূতি সাধকের পক্ষে সম্ভব হইয়া ওঠে। তল্লগ্ন বাড়ী—অর্থাৎ তৃতীয় মহাশূন্যের পাশের বাড়ীই হইল জ্যোৎস্না বাড়ী—অর্থাৎ প্রভাস্বরধাম; এই প্রভাস্বর ধামের প্রকাশের দ্বারা অলীক যত অন্ধকার চারিদিকে পুঞ্জীভূত হয় তাহা সবই মুহূর্তে দূরীভূত হইয়া গেল।

এই চর্যাকারগণ সকলেই সহজিয়া বৌদ্ধ ছিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম মহাযান হইতে উদ্ভূত; এইজন্য মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে মূল কথা—অর্থাৎ শুধু শূন্যতাকে গ্রহণ করিলে চলিবে না—শূন্যতার সহিত মহাকরুণাকে অভেদে মিলাইয়া লইতে হইবে—এই তত্ত্ব চর্যাপদগুলির মধ্যেও নানাভাবে ছড়ান দেখি। সাধনার ক্ষেত্রে এই সহজিয়া সাধকগণ শূন্যতা ও করুণাকে যেভাবে মিলাইয়া লইয়াছেন তাহা ছাড়াও চর্যাপদগুলির ভিতরে নানাভাবে এই শূন্যতা ও করুণার মিলনের কথা আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি কম্বলাম্বরপাদ তাঁহার করুণার নৌকাকে সোনা—অর্থাৎ শূন্যতাদ্বারা ভরিয়া লইয়াছেন (৮নং পদ)। কাহ্নপাদ যেখানে দাবাখেলার রূপকে সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেখানেও দেখি, 'করুণা পিহাড়ী খেলহু

নঅবল'—করুণার পিঁড়িতে তিনি দাবা খেলিতে বসিয়াছেন অর্থাৎ মহা-করুণাতেই তাঁহাদের সকল সাধনার প্রতিষ্ঠা। অন্যত্র কাহ্ণপাদ বলিয়াছেন 'নিঅ দেহ করুণা শূনমেঁ হেরী' (১০)।

বৌদ্ধ চর্যাগীতি, দোঁহা এবং বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে এই করুণার এমন একটা প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে এ-বিষয়ে এই প্রসঙ্গে আর একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ করি। এই করুণার উপরে জোর দিয়াই মহাযানী বৌদ্ধগণ বোধিসত্ত্বের আদর্শকে প্রাচীন অর্হতের আদর্শ হইতে অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। অর্হৎগণ শূন্যতাকে অবলম্বন করিয়া নির্বাণ লাভ করিতেন; কিন্তু মহাযানিগণ নির্বাণ লাভের বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের আদর্শ ছিল এই, নির্বাণ লাভের উপযুক্ত হইয়া নির্বাণকে উপেক্ষা করিতে হইবে, দুঃখ প্রপীড়িত প্রাণিগণের জন্য কল্প-কল্পান্তর দেহ ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে অবস্থান করিতে হইবে কুশল-কর্মের জন্য।

ভগবান্ বুদ্ধ ছিলেন করুণাঘন মূর্তি, বিশ্বের সমস্ত করুণা ঘনীভূত হইয়াই যেন তাঁহার জ্যোতির্ময় দিব্য দেহখানি গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার এই করুণার ক্ষেত্র শুধু বিশ্বমানবের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, নিখিল জীবকোটির ভিতরে ইহা নিঃসীমভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। মহাযানিগণ মনে করিতেন, বুদ্ধ-দেবকে অবলম্বন করিয়া যে জাতক-গল্পগুলির তাহা বোধিসত্ত্বের করুণাময়ত্বেরই অভিব্যঞ্জক। তিনি করুণায় বিগলিত হইয়া যুগে যুগে জন্মে জন্মে সর্ববিধ যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া সর্বশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে কুশল-কর্মের মহিমা প্রচার করিয়াছেন তাঁহার বাস্তব আচরণের ভিতর দিয়া।

মহাযানমতে করুণার ভিত্তিভূমি হইল একটা অদ্বয়বোধ, নিখিল বিশ্বের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এক করিয়া দেখা। এই অদ্বয়বোধ মানুষের চিত্তকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডী হইতে মুক্তি দান করে, চিত্তের ভিতরে আনে অসীম প্রসার। এই চিত্ত-প্রসারই আমাদিগকে বৃহৎ করিয়া তোলে। বৌদ্ধ 'ব্রহ্মবিহারে'রও তাই একটি প্রধান উপাদান করুণা। ব্রহ্মবিহার কথাটিকে কোনও পারিভাষিক অর্থে যদি সীমাবদ্ধ না রাখি তবে ব্রহ্ম শব্দটিকে এখানে ইহার সাধারণ 'বৃহৎ' অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে; নিজেদের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া বা তাহাকে প্রসারিত করিয়া একটি বৃহৎ অস্তিত্বের মধ্যে বিহার করাকেই আমরা ব্রহ্মবিহারের তাৎপর্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে এই করুণাই একরূপ ধর্মের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল। এই করুণার বিশুদ্ধির জন্যই চাই শূন্যতা, নতুবা কুশলকর্মের প্রেরক এই করুণাই

হয়ত মানুষকে শুভাশুভ কর্মের দ্বারা ক্লিষ্ট করিবে। কিন্তু করুণাকে ছাড়িয়া কেহ যদি শুধু নিবৃত্তিমূলক শূন্যতার পথই অবলম্বন করে, তবে সে বিশ্ববিমুখ হইয়া একেবারেই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িবে। এই একান্ত আত্ম-কেন্দ্রিকতাই হইতেছে সবচেয়ে বড় হীনতা, এই জন্যই শুধু মাত্র শূন্যতার পথকে বলা হইতেছে হীনযান।

অনেক পরবর্তী কালের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দেখিতে পাই, এই করুণাই দেখা দিল সব তান্ত্রিক সাধনার মূলনীতি রূপে। বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে দেখিতে পাই, যেখানে ভিন্ন দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার বিধান রহিয়াছে—এমন কি যক্ষ-রক্ষ, ভূতযোনি বা উপদেবতার তান্ত্রিক মতে পূজার্চনার বিধি রহিয়াছে তাহার সর্বত্রই সর্ব ক্রিয়াঙ্গের প্রথমে সাধককে সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে যে, ব্রহ্মাণ্ডের জীবকোটির দুঃখে করুণাদ্রচিত্ত হইয়াই তিনি এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড করিতেছেন,—'জগদুদ্ধরণ' চেষ্টাতেই সব কিছু কৃত; এই সকল কর্মের দ্বারা যাহা কিছু পুণ্য লাভ হইবে তাহা সকলই প্রাপ্য জগৎ-জীবের। শুদ্ধ-তান্ত্রিক যোগসাধনার ক্ষেত্রেও যোগীকে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হয়—এই সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। এই সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত হওয়া শব্দের অর্থই হইল করুণায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মহা করুণায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠা না ঘটিলে কোনও সাধকের কোনও তান্ত্রিক সাধনাতেই অধিকার ঘটে না।

পরবর্তী কালের তান্ত্রিক দোঁহাকারগণের দোঁহা-গীতিতেও এই করুণার বাণীর অপূর্ব প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। এই করুণাকে বলা হইয়াছে নৌকা। নৌকা কখনও আপনা আপনি নদীর এপার ওপার করে না, সে অপরকেও এপার ওপার করায়। এই যে সকলের জন্য এক—একের জন্য সকল—ইহাই হইল শ্রেষ্ঠ পথ—ইহাই মহাযান। সরহপাদ তাঁহার দোঁহায় বলিয়াছেন,—

করুণা ছড্ডি জো সুন্নহিঁ লগ্‌গু।
ণউ সো পাবই উত্তম মগ্‌গু॥

'করুণাকে ছাড়িয়া যে হয় 'শূন্য'তে লগ্ন সে কখনও পায় না উত্তম পথ।'
কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, শূন্যতাকে ছাড়িয়া কেবল মাত্র করুণা আশ্রয় করিলে তাহাতেও কুশল-অকুশল কর্ম দ্বারা ক্লিষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই—

অহবা করুণা কেবল ভাবই।
জম্ম সহস্সহি মোক্‌খ ণ পাবই॥

'অথবা কেবল করুণাকে যে ভাবে জন্ম-সহস্রেও সে মোক্ষ পায় না।'

সরহ বলিয়াছেন,—

এহু সো অপ্পা এহু পরু জো পরিভাবই কোবি।
তেঁ বিণু বন্ধে বেট্‌ঠি কিউ অপ্প বিমুক্কউ তোবি॥

'এই হইল আপন, এই হইল পর—এই ভাবে যে কেউ পরিভাবনা করে, তাহারা বিনা বন্ধনে বিমুক্ত নিজেকে আবার বন্ধনে বেষ্টিত করে।'

পর অপ্পাণ ম ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
এহু সে নিক্কল পরম পউ চিত্ত সহাবেঁ সুদ্ধ॥

'পর ও আপন এই ভ্রান্তি কখনও করিও না; সকলই নিরন্তর বুদ্ধ (পরমার্থতঃ)। এই যে পরম প্রভু চিত্ত—ইহা স্বভাবে (স্বরূপে) শুদ্ধ।' অর্থাৎ স্বরূপে সবই শুদ্ধ—সবই এক; অতএব পর এবং আপন এই বোধ একান্তই ভ্রান্তি মাত্র।

অদ্বয় চিত্ত তরুঅরহ গউ তিহুবণেঁ বিত্থার।
করুণাফুল্লীফল ধরই ণাউ পরত্ত উআর॥

'(আমাদের যে) অদ্বয় চিত্ত (অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত চিত্ত) তাহা একটি বিরাট তরুবরের মত—সে ত্রিভুবনে বিস্তার লাভ করিয়াছে; (এই অদ্বয় চিত্ততরুবর) ধরে করুণার ফলফুল—ইহার পরে আর কিছুই নাই (ইহাই হইল পরমতত্ত্ব)।'

সুণ্ণ তরুবর ফুল্লিঅউ করুণা বিবিহ বিচিত্ত।
অপ্পা ভোঅ পরত্তফলু এহু সোক্‌খ পরু চিত্ত॥

'শূন্যতরুবর ফুল্লিত হইয়াছে—বিবিধ বিচিত্র করুণা; অন্য ভোগে পরত্র ফল, এই চিত্তেই হইল পরম সুখ।'

একেক্ষো একেবি তরু তেঁ কারণে ফল এক।
এ অভিণ্ণা জো মুণই সো ভবনিব্বাণ বিমক্ক॥

'সবই এক—তাই একই হইল তরু—সেই কারণে ফলও হইল এক। ইহাকে অভিন্ন বলিয়া যে মনে করে সে হয় ভব-নির্বাণ বিমুক্ত।'

জো অত্থীঅণ ঠীঅউ সো জই জাই ণিরাস।
খণ্ড-সরাবেঁ ভিক্‌খ বরু চ্ছড়হু এ গিহবাস॥

'যে ব্যক্তি অর্থী সে যদি যায় নিরাশ হইয়া—তবে খণ্ড সরাবে ভিক্ষাই ভাল—ছাড় এই গৃহবাস।'

পরউ আর ণ কিঅউ অত্থি ণ দীঅউ দাণ।
এহু সংসারে কবণ ফলু বরু ছড্‌ডহু অপ্পাণ॥

'পরের উপকার করা হয় না—অর্থীকেও দেওয়া হয় না দান—এমন সংসারে কিই বা ফল—বরং ছাড় আপনাকে।'

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধন-তত্ত্ব

॥ ১ ॥

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণের সাধনার একটা আভাস পাইতে হইলে আমাদিগকে মুখ্যভাবে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রচিত চর্যাপদগুলি এবং দোঁহা-গুলিকে আশ্রয় করিতে হয়; কারণ সহজিয়া সাধকগণের মতবাদটি এখানে যেরূপ বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায় অন্যত্র সেইরূপভাবে তাহা কোথাও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও সহজিয়াগণের সাধনার কথা ছড়ান আছে বটে, কিন্তু সেখানে সহজিয়াদের বৈশিষ্ট্য কিছুই ফুটিয়া ওঠে নাই,—সেখানে নানা প্রকার পূজা-অর্চা, ক্রিয়া-কাণ্ড, তন্ত্র-মন্ত্র, যোগ-সাধনার সহিত সহজিয়াদের সাধনার কথা ছড়াইয়া রহিয়াছে।

সহজিয়াগণের সাধনার কথা বুঝিতে হইলে সহজযানের ইতিহাস সম্বন্ধেও একটা সাধারণ ধারণা থাকা উচিত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম হইতেই এই সকল ধারার উদ্ভব। মহাযান তাহার 'মহা যান' লইয়া যখন উপস্থিত হইল তখন সমাজের সর্বস্তরের পারগামী লোকের জন্যই সেখানে স্থান করিতে হইল। বিভিন্ন ধরণের ধর্মবিশ্বাস এবং প্রচলিত সাধন-পদ্ধতি লইয়া নানা ধরণের লোক প্রবেশ লাভ করিল মহাযানের 'মহা যানে'; ফলে আস্তে আস্তে মহাযানও পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল। মহাযানের মধ্যে ক্রমে দেখা দিল দুইটি মত; 'পারমিতা-নয়' এবং 'মন্ত্র-নয়'। যাঁহারা পারমিতার অনুশীলনের দ্বারা বৌদ্ধ দশভূমি অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বাবস্থা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন তাঁহাদের মত হইল 'পারমিতা-নয়'; কিন্তু অপর দল এত পারমিতার অনু-শীলনের উপরে জোর দিলেন না, তাঁহারা জোর দিলেন বিবিধপ্রকারের মন্ত্রের উপরে। এই মন্ত্রের সহিত আসিয়া দেখা দিল 'মুদ্রা' ও 'মণ্ডল'; এই 'মন্ত্র', 'মুদ্রা' ও মণ্ডল' লইয়া পত্তন হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মই কিছুদিনের মধ্যে সাধারণ নাম গ্রহণ করিল 'বজ্র-যান'। এই বজ্রযানের মধ্যে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ব্যতীত নানা প্রকার দেবদেবীর পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা, অন্যান্য তান্ত্রিক ক্রিয়া-বিধি এবং কতকগুলি গুহ্য যোগ-সাধনা প্রবর্তিত হইল। 'বজ্র' শব্দের অর্থ শূন্যতা; সুতরাং বজ্রযানের মূল অর্থ হইল শূন্যতা-যান। বজ্রযানের

সবই 'বজ্র'; দেব-দেবী, পূজা-বিধি, উপকরণ সামগ্রী, সাধনাঙ্গ—সবই 'বজ্র'-চিহ্নিত। নেপাল তিব্বতে বজ্রযানের আর একটি রূপ দেখা গেল 'কালচক্র-যানে'; এই মতে শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রবাহকেই ধরা হইয়াছে কাল-প্রবাহের বাহন বলিয়া; সেই শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রবাহকে নানাভাবে নিরুদ্ধ করিয়া কালচক্র (কালের চক্রকে) অতিক্রম করিতে হইবে। সাধনার এই দিকটার উপরে জোর দেওয়াই হইল কালচক্র-যানের বৈশিষ্ট্য।

বৌদ্ধ তন্ত্রাদিতে 'সহজযান' এই নামে বিশেষ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আমরা পাই না। বজ্রযান-পন্থী একদল সাধকের কতকগুলি মতবৈশিষ্ট্য এবং সাধন-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই এই নামটি পরবর্তী কালে গড়িয়া তোলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সম্প্রদায়ের সাধকগণকে সহজিয়া বলিবার দুইদিক্ হইতে সার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ ইহাদের 'সাধ্য'ও ছিল 'সহজ'—আবার 'সাধন'ও ছিল সহজ। প্রত্যেক জীবের—প্রত্যেক বস্তুরই একটি 'সহজ' স্বরূপ আছে—ইহাই সকল পরিবর্তনশীলতার ভিতরে অপরিবর্তিত স্বরূপ। এই-সহজ-স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া মহাসুখে মগ্ন হইতে হইবে—ইহাই হইল এইপন্থী সাধকগণের মূল আদর্শ—এই জন্যই ইহারা হইলেন সহজিয়া। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সাধনার জন্য কোন বক্রপথ অবলম্বন করিতেন না—গ্রহণ করিতেন সরল সোজা পথ, এই জন্যও তাঁহারা সহজিয়া। এই জন্য সিদ্ধাচার্যরা বলিয়াছেন—

উজুরে উজু ছাড়ি মা জাহুরে বঙ্ক।
নিয়ড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক॥

'ঋজু হইল এই পথ—ঋজুকে ছাড়িয়া কেহ যাইও না বাঁকা পথে; নিকটে আছে বোধি—যাইও না (দূর) লঙ্কায়।'

সিদ্ধাচার্যগণ সর্বত্রই তাঁহাদের দর্শিত পথকে 'উজুবাট' (ঋজুবর্ত্ম) বা সোজা পথ বলিয়াছেন। বাঁকা পথ কাহাকে বলে? শাস্ত্র-তর্ক-পাণ্ডিত্যের পথ, ধ্যান-ধারণার-সমাধির পথ—বিবিধ তন্ত্র-মন্ত্র—আচার-পদ্ধতির পথই হইল বাঁকা পথ। সমস্ত লোকেরই হইল এই গর্ব যে 'আমিই হইলাম পরমার্থে প্রবীণ'; কিন্তু কাহ্ন পাদ তাঁহার দোহায় বলিতেছেন যে 'পরমার্থে প্রবীণ' হইলে কি হইবে,—যাঁহারা পরমার্থ-প্রবীণ তাঁহাদের ভিতরে কোটির মধ্যে একজনও যে 'নিরঞ্জনে লীন' নহেন।

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউ পরমত্থ পবীণ।
কোড়িহ মাহ একু নহি হোই নিরঞ্জন লীণ॥

পণ্ডিতেরা মান বহন করেন কি লইয়া?—তাঁহাদের মান হইল আগম-বেদ-পুরাণের পাণ্ডিত্য লইয়া; কিন্তু এই যে সত্যের চারিপাশে পাণ্ডিত্যের গুঞ্জন ইহা হইল ঠিক একটি পাকা বেলের চারিপাশে অলির গুঞ্জন। অলি যেমন পাকা বেলের গন্ধ পায়, আর সেই গন্ধে মুগ্ধ হইয়া বেলের চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিতে থাকে গুঞ্জন—কিন্তু বেলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আসল বস্তুর যথার্থ আস্বাদন করিতে পারে না—পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহারাও তেমনই পরমাস্বাদ্য 'মহাসুখ' বা 'সহজানন্দে'র চারিপাশে পাণ্ডিত্যের মত্ততা লইয়াই ঘুরিয়া মরে—কিন্তু সত্যের ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে আস্বাদন করিতে পারে না।

আগম বেঅ পুরাণে পংডিআ মাণ বহন্তি।
পক্ক সিরিফলে অলিঅ জিম বাহেরিঅ ভমন্তি॥

তিল্লোপাদ বলিয়াছেন, যাহা পরমার্থ-তত্ত্ব তাহা হইল সম্পূর্ণ স্ব-সংবেদ্য, নিজের ভিতরেই করিতে হয় তাহার অনুভব; যাঁহারা মন-ইন্দ্রিয়কে প্রধান-ভাবে অবলম্বন করেন—বুদ্ধি দ্বারাই লাভ করিতে চান সত্যকে—তাঁহাদের ভিতরে যাহা প্রবেশ করে তাহা কখনই পরমার্থ নয়।—

সঅসংবেঅণ তত্তফল তীলপাঅ ভণন্তি।
জো মণগোঅর পইট্‌ঠই সো পরমত্থ ণ হোন্তি॥

আরও সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন সরহপাদ—

অক্‌খরবাঢ়া সঅল জগু ণাহি ণিরক্‌খর কোই।
তাব সে অক্‌খর ঘোলিআ জাব ণিরক্‌খর হোই॥

অক্ষরে বদ্ধ হইয়া আছে সকল জগৎ—নিরক্ষর নাই কেহই; কিন্তু এই সকল অক্ষর যাইবে ঘোলাইয়া যখন কেহ হইতে পারিবে 'নিরক্ষর'।

এই শাস্ত্র-তর্ক পাণ্ডিত্যের পথকে যেমন সহজিয়ারা বাঁকা পথ বলিয়াছেন, তেমনই বাঁকা পথ বলিয়াছেন সকল ক্রিয়া-কাণ্ডের বাহ্যাড়ম্বরকে—সকল প্রকার যোগের 'ভড়ং' এবং সিদ্ধাইকে। এ বিষয়ে প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা রহিয়াছে বলিয়া (এই গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট 'চর্যাপদের যুগের বাঙলা ও বাঙালী' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য) এইখানে আর বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, 'সহজ'ই ছিল বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধ্য—অর্থাৎ—আমাদের রূপের মধ্যে যে একটি 'অরূপ' সত্তা রহিয়াছে—শরীরের মধ্যে যে এক অশরীর রহিয়াছে—তাহাকে উপলব্ধি করাই হইল চরম লক্ষ্য। চর্যাকার এবং দোহাকারগণ বার বার বলিয়াছেন,—এই 'সহজ' হইল বাক্য-মনের

অগোচর—সুতরাং তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিবার কোনও উপায় নাই—শুধু কোনও রূপে তাহার অনুভূতির একটা আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া যাইতে পারে মাত্র। সরহপাদ ভারী চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন, নিজের স্বভাব নিজেই জানা যায়—অন্যে তাহার কথা কি করিয়া বলিবে? শুধু গুরুর উপদেশই পারে তাহা দেখাইয়া দিতে—অন্য কিছুতে নয়।

ণিঅ-সহাব ণউ কহিঅউ অণ্ণেঁ।
দীসই গুরু উবএসেঁ ণ অণ্ণেঁ॥

যাঁহারা নিপুণ যোগী তাঁহাদের মন নিঃশেষে যায় বিলীন হইয়া সহজের মধ্যে—যেমন জল যায় নিঃশেষে বিলীন হইয়া জলের মধ্যে।

ণিঅ মণ মুণহু রে ণিউণে জোই।
জিম জল জলহি মিলন্তে সোই॥

বৌদ্ধতন্ত্রে দেখিতে পাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে সহজই হইল স্বরূপ—সমস্ত জগতেরই মূল-স্বরূপ—সুতরাং স্বরূপই নির্বাণ—অতএব সহজই হইল নির্বাণ।

তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্বং সহজং স্বরূপমুচ্যতে।
স্বরূপমেব নির্বাণং বিশুদ্ধাকার চেতসঃ॥ (হেবজ্র-তন্ত্র)

অন্যত্র বলা হইয়াছে 'স্বভাবং সহজমিত্যুক্তং' (ঐ),—স্ব-ভাবই হইল সহজ। সেই সহজ একদিকে দেহস্থ—কারণ দেহের মধ্যে তাহার বাস,—কিন্তু দেহস্থ হইলেও সে দেহজ নয়,—'দেহস্থোঽপি ন দেহজঃ, (ঐ)। দোহাকারগণ বলিয়াছেন,—সহজ হইল আদি রহিত এবং অন্তরহিত—এই যে আদি-অন্ত-রহিত শাশ্বত স্বরূপ ইহাকেই বজ্রগুরুগণ অভিহিত করেন অদ্বয় বলিয়া।

আই-রহিঅ এহু অন্ত রহিঅ।
বরগুরু-পাঅ অদ্দয় কহিঅ॥

এই সহজ— গুণ-দোস রহিঅ এহু পরমথ।
সঅসংবেঅণ কেবি ণথ॥
... ...
বণ্ণ বি বজ্জই আকিই বিহুণ্ণ।
সব্বাআরে সো সম্পুণ্ণ॥

ইহা হইল সর্বপ্রকারের গুণ-দোষ রহিত—ইহাই হইল পরমার্থ; ইহা হইল স্ব-সংবেদ্য তত্ত্ব—···ইহা সর্বপ্রকারের বর্ণবিবর্জিত এবং আকৃতিবিহীন, সর্বাকারে এই সহজ আছে সম্পূর্ণ হইয়া।

সরহপাদ তাঁহার দোঁহাতে বলিয়াছেন,—

সঙ্কপাস তোড়হু গুরুবঅণেঁ।
ণ সুণই সোণউ দীসই ণঅণেঁ॥
পবণ বহন্তে ণউ সো হল্লই।
জলণ জলন্তে ণউ সো উজ্ঝই॥
ঘণ বরিসন্তে ণউ সো সিজ্জই।
ণউ বজ্জই ণউ খঅহি পইস্সই॥
ণউ বট্টই ণ তণুন্তে ণ বজ্জই।
সমরস সহজাণন্দ জাণিজ্জই॥

শঙ্কাপাশ সব ছিঁড়িয়া ফেল গুরুর বচনে; এই শঙ্কা দূরীভূত হইয়া গেলে আভাস পাওয়া যাইবে সহজের, যাহাকে শ্রবণ কখনও শোনে না, চোখের দ্বারা যাহাকে যায় না দেখা। পবন বহিলে তাহা শব্দায়মান হয় না, জ্বলন (অগ্নি) জ্বলিলে তাহা পোড়ে না; ঘন বর্ষায় তাহা ভেজে না, তাহা বাড়েও না—তাহা ক্ষয়প্রাপ্তও হয় না। তাহা (একস্থানে) থাকে না, বিকৃতও হয় না—কোথাও যায়ও না,—সমরসই হইল সহজানন্দ।

'সহজে'র এই বর্ণনা পাঠ করিলে আমরা লক্ষ্য করিতে পারিব, ইহা গীতা-প্রভৃতি জনপ্রিয় শাস্ত্রে দেহের ভিতরকার যে অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, স্থাণু, অচল এবং সনাতন দেহীর কথা বলা হইয়াছে সেই বর্ণনার সহিতই সমসূত্রে গ্রথিত। আমাদের এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন কি করিয়া অনাত্মবাদী বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্ভূত তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বা সহজিয়াগণ এমন করিয়া স্পষ্ট আত্মবাদে না হোক, একটা স্বরূপ-বাদে আসিয়া পৌঁছিল। দীর্ঘকালের চিন্তার আবর্তনের ভিতর দিয়া এই পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে।

॥ ২ ॥

বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনার দিক হইতে আর একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহা হইল এই যে, চরম 'সাধ্য' রূপে তাঁহারা যে সহজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই সহজকে তাঁহারা 'সহজ' রূপেও উল্লেখ করিয়াছেন, আবার 'সহজানন্দ'রূপেও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে 'সহজ'ই 'সহজানন্দ'। সে কথার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হইল এই যে সহজ-স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই নির্বিকল্প পরম আনন্দ হয়—সেই নির্বিকল্প পরম আনন্দই হইল সহজানন্দ। সেই সহজানন্দকেই সহজিয়া

বৌদ্ধগণ বলিয়াছেন 'মহাসুখ'। বৌদ্ধতন্ত্রে এই 'মহাসুখে'র দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ যে চরম লক্ষ্য নির্বাণের কথা বলিয়াছেন সেই নির্বাণের স্বরূপ কি ইহা লইয়া অদ্যাবধি পণ্ডিতমহলে বিতর্কের অন্ত নাই। নির্বাণ কথাটি সাধারণত নির্+বা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হয়,—অর্থ হইল নিভিয়া যাওয়া—নিঃশেষ হইয়া যাওয়া,—যেমন দীপধারা স্নেহক্ষয়ে নিভিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। এই নিভিয়া যাওয়া বা জুড়াইয়া যাওয়ার অর্থটি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে পালি 'মহাভিনিক্খমণ' সূত্রে (নিদান-কথা)। সেখানে দেখি, যুবরাজ সিদ্ধার্থের অনিন্দ্যরূপে মুগ্ধ হইয়া 'কিসা-গোতমী' নামক একটি ক্ষত্রিয় কন্যা অলিন্দ হইতে একটি গান করিয়াছিল,—

নিব্বুতা নূন সা মাতা নিব্বুতো নূন সো পিতা।
নিব্বুতা নূন সা নারী যস্‌সা'য়ং ইদসো পতি॥

অর্থাৎ 'জুড়াইয়া গিয়াছে সেই মা (মায়ের হৃদয়) যাঁহার এমন ছেলে, জুড়াইয়া গিয়াছে সেই পিতা (পিতার হৃদয়) যাঁহার এমন ছেলে—জুড়াইয়া গিয়াছে সেই স্ত্রী (স্ত্রীর হৃদয়) যাঁহার এমন স্বামী।' এই কথাটির ভিতরকার 'নিব্বুত' (নির্বৃত) কথাটি যুবরাজ সিদ্ধার্থকে ভাবাইয়া তুলিল; তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এই কন্যাটি তাহার গানে বলিল, মায়ের হৃদয় জুড়াইয়া যায়, পিতার হৃদয় জুড়াইয়া যায়—স্ত্রীর হৃদয় জুড়াইয়া যায়,—কিন্তু সত্য সত্যই কি জুড়াইয়া গেলে মায়ের হৃদয়, পিতার হৃদয়, স্ত্রীর হৃদয়—সকলের হৃদয়ই জুড়াইয়া যায়? তাহাই দেখা দিল কুমারের মনে একটা মহা জিজ্ঞাসার রূপে, কস্মিং নু খো নিব্বুতে হৃদয়ং নিব্বুতং নাম হোতি?

এই মহাজিজ্ঞাসার উত্তর কুমার সিদ্ধার্থ নিজের বিষয়বিরক্ত ধ্যানপরায়ণ মনের মধ্যেই লাভ করিলেন; তিনি বুঝিলেন,—'রাগগ্‌গিম্‌হি নিব্বুতে নিব্বুতং নাম হোতি, দোসগ্‌গিম্‌হি মোহগ্‌গিম্‌হি নিব্বুতে নিব্বুতং নাম হোতি'—হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে যে রাগের আগুন, যে দ্বেষের আগুন, যে মোহের আগুন—সেই আগুন নির্বাপিত হইলেই আসে হৃদয়ের যথার্থ নির্বাণ। কুমার ভাবিলেন, এই কন্যাটি ত আমাকে বড়ই সুন্দর সঙ্গীত শুনাইয়াছে,—আমি এই 'নির্বাণে'র সন্ধান করিয়াই বেড়াইব, 'অহং হি নিব্বাণং গবেসন্তো চরামি।'

এখানে দেখিতেছি হৃদয়ের আগুন নিভাইয়া ফেলাই হইল নির্বাণ। এই নির্বাণকে পালি শাস্ত্রে আরও অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই।

সেখানে সমগ্র জীবন-প্রবাহকেই একটি প্রদীপকে অবলম্বন করিয়া প্রজ্বলিত আলোশিখার প্রবাহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; বাসনাই হইল এই জীবন-দীপে 'স্নেহ'-স্বরূপ; স্নেহক্ষয়ে যেমন দীপের আলোশিখা-প্রবাহ একেবারে নিভিয়া যায়, সেইরূপ সর্ববাসনা ক্ষয় হইলে—ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণ নষ্ট হইলে সুখদুঃখময় জীবন-প্রবাহ নিঃশেষে থামিয়া যায়—ইহাই নির্বাণ।

কিন্তু ইহা ত নির্বাণের একটা নঞর্থক (negative) বর্ণনা মাত্র হইল; সব নিভিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবার অর্থ কি? কিছুই কি থাকে না? দার্শনিক-গণ এ-বিষয়ে স্পষ্ট কোনও জবাব দেন নাই। যে জবাব দিয়াছেন তাহা হইতেও কেহ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছি কিছুই থাকে না—কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছি কিছু থাকে। সেই দার্শনিক তর্কে এখানে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে এইটুকু লক্ষ্য করিতে পারি যে, দার্শনিকগণ নির্বাণকে যতই নেতিমার্গে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করুন না কেন পালি শাস্ত্রে ও সাহিত্যে—এবং পরবর্তী বৌদ্ধ-সাহিত্যে নির্বাণ একটা পরম 'নাস্তিত্ব' মাত্র নয়,—নির্বাণই সুখ, নির্বাণই শান্তি। অশ্বঘোষ তাঁহার 'সৌন্দরানন্দ কাব্যে' যেখানে নির্বাণের সঙ্গে দীপ-নির্বাণের তুলনা দিয়াছেন সেখানে তিনিও বলিয়াছেন যে দীপ যেমন 'স্নেহক্ষয়াৎ শান্তিমত্যন্তমেতি'—স্নেহক্ষয় বশতঃ নির্বাপিত হইয়া অত্যন্ত শান্তি লাভ করে, জীবন-প্রদীপও 'ক্লেশক্ষয়াৎ শান্তিমত্যন্ত-মেতি'—ক্লেশক্ষয়ে অত্যন্ত শান্তি লাভ করে। এই যে অত্যন্ত শান্তি লাভ করার সত্যটি তাহা পালি 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো'র মধ্যে নির্বাণ সম্বন্ধে বহু আলোচনার প্রসঙ্গে অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারি। পালি শাস্ত্রে এই নির্বাণকে বলা হইয়াছে 'পরং', 'সন্ত' (শান্ত), 'বিসুদ্ধ' (বিশুদ্ধ), 'সন্তি' (শান্তি), 'অক্খর' (অক্ষর), 'ধ্রুব', 'সচ্চ' (সত্য), 'অনন্ত', 'অচ্চুত', 'সস্সত' (শাশ্বত), 'অমত' (অমৃত), 'অজাত', 'কেবল', 'সিব' (শিব)।'[১] 'সুত্তনিপাতে' দেখিতে পাই নির্বাণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'সন্তী'তি নিব্বাণং ঞত্বা অর্থাৎ নির্বাণকে শান্তি বলিয়া জানিয়া। ধম্মপদে একাধিক স্থানে বলা হইয়াছে, 'নিব্বাণং পরমং সুখং'। 'অঙ্গুত্তর-নিকায়ে' বলা হইয়াছে—

ওধুনিত্বা মলং সব্বং পত্বা নিব্বাণ সম্পদং।
মুচ্চেতি সব্বদুঃখেহি সা হোতি সব্ব সম্পদা॥'[২]

(১) এই প্রসঙ্গে রীস্ ডেভিড্‌স্ কৃত 'পালি ভাষার অভিধান' গ্রন্থে 'নির্বাণ' শব্দটি দ্রষ্টব্য।

(২) উপরি উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।

'বিমান-বত্থু'তে নির্বাণকে বলা হইয়াছে অচল স্থান—যেখানে গিয়া আর শোক করিতে হয় না—'পত্তা তে অচলট্ঠানং যথা গন্ত্বা ন সোচরে'। 'থেরী-গাথা'য় সমজাতীয় উক্তি দেখিতে পাই,—'নিব্বাণ ট্ঠানে বিমুত্তা তে পত্তা তে অচলং সুখং'।

নির্বাণকে এই যে পরম সুখ বা পরম শান্তি বলিয়া বর্ণনা পরবর্তী কালের তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ এইখান হইতে তাঁহাদের সাধ্যবস্তুর ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টভাবেই বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করিলেন যে পরম সুখই লইল নির্বাণের স্বরূপ—তাঁহারা ইহার নাম দিলেন 'মহাসুখ'। কিন্তু তাঁহারা এইখানেই থামিলেন না; তাঁহারা বলিলেন নির্বাণ যে মহাসুখ তাহা নহে—মহাসুখই হইল নির্বাণ। একটি বিশেষ প্রকারের সাধনা দ্বারা চিত্তকে যদি এই মহাসুখের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া যায় তবে যাহা বাকি থাকে—তাহাই স্বরূপ—তাহাই হইল সহজ; মহাসুখের মধ্যে সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্পের বিলয় ঘটিলেই এই সহজ-স্বরূপে অবস্থান ঘটে; সুতরাং মহাসুখই হইল সহজানন্দ। এই সহজানন্দ বা স্বরূপানুভূতির ক্ষেত্রে কোনও জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞেয়ত্ব বা গ্রাহকত্ব গ্রাহ্যত্ব থাকে না; গ্রাহ্যত্ব-গ্রাহকত্ব-বর্জিত যে স্বরূপ তাহাই হইল অদ্বয় স্বরূপ, অদ্বয়ই হইল সহজ—সহজই হইল মহাসুখ। সুতরাং এই মহাসুখে স্থিতি লাভের দ্বারা যে অদ্বয়ে বা সহজে স্থিতি, ইহাই হইল বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধনার মূল লক্ষ্য। আবার দেখিতে পাইব, এই অদ্বয় মহাসুখে বা সহজে প্রতিষ্ঠা এবং বোধিচিত্ত লাভ সহজিয়াগণের নিকটে একই কথা—কারণ অদ্বয়ই হইল বোধিচিত্ত।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধনার কথা বুঝিতে হইলে এই বোধিচিত্তের ধারণাটাও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বোধিচিত্ত শব্দের অর্থ হইল বোধিলাভের জন্য এবং সেই বোধিলাভের দ্বারা সর্বভূতের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত একটি 'চিত্ত'—অর্থাৎ দৃঢ় চেতনা বা সঙ্কল্প উৎপাদন করা। এই বোধি-চিত্ত উৎপন্ন হইলেই চিত্তের ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়—দশটি ভূমি অতিক্রম করিয়া চিত্ত 'ধর্মমেঘ' রূপ দশভূমিতে স্থিতি লাভ করে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই বোধিচিত্ত একটি বিশেষ অর্থগ্রহণ করিল। শূন্যতা এবং করুণার অভিন্নাবস্থাকেই বলা হয় বোধিচিত্ত—'শূন্যতা-করুণা-ভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে'। এই শূন্যতা এবং করুণার অভিন্নত্বের তাৎপর্য কি? এই তাৎপর্য নানা দিক হইতে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ধর্মমতের দিক হইতে বলা যাইতে পারে, বৃহত্তর সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া শুধুমাত্র শূন্যতা-সাধনের দ্বারা নির্বাণ লাভের চেষ্টা না করিয়া

করুণা অবলম্বনে বিশ্বজীবের মঙ্গলের জন্ত কুশলকর্মের পথ গ্রহণ করাই হইল এই বোধিচিত্ত-সাধনার তাৎপর্য। এই শূন্ততাকে বলা হয় 'প্রজ্ঞা'—কারণ শূন্ততা-জ্ঞানই ত হইল প্রজ্ঞা; আর করুণাকে বলা হয় 'উপায়'—কারণ করুণাই বিশ্বজীবের মঙ্গলের উপায়। এই 'প্রজ্ঞোপায়ে'র মিলন হইতেই লাভ হয় বোধিচিত্ত। দর্শনের দিক হইতে শূন্ততাই হইল গ্রাহক—principle of subjectivity; আর করুণা হইল গ্রাহ্য—principle of objectivity; এই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বের দুইটি প্রবহমাণ ধারা নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায় যে অদ্বয়-তত্ত্বে সেই অদ্বয়তত্ত্বই হইল বোধিচিত্ত—তাহাই সহজস্বরূপ। যোগ-সাধনার দিক হইতে দেখিতে পাইব, আমাদের দেহের মধ্যে তিনটি প্রধান নাড়ী আছে—একটি বামগা—শ্বাসবাহী নাড়ী বা প্রাণবাহী নাড়ী,—অপরটি হইল দক্ষিণগা—প্রশ্বাসবাহী নাড়ী বা অপানবাহী নাড়ী; এই দুই হইল দেহমধ্যে সর্বপ্রকার দ্বৈততত্ত্বের প্রতীক বা প্রতিনিধি; আর একটি নাড়ী আছে মধ্যগা নাড়ী—তাহাকে বৌদ্ধতন্ত্রে বলা হয় অবধূতি বা অবধূতিকা; উভয় নাড়ীর ক্রিয়া এবং ধারাকে অবলম্বন করিয়া চলে সংসারের গতি—ইহারাই একটি 'ভব' (অস্তিত্ব) অপরটি 'নির্বাণ' (অনস্তিত্ব)—একটি সৃষ্টি—অপরটি সংহার—একটি 'ইতি', অপরটি 'নেতি'; এই উভয়ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক নিম্নগা ধারাকে অবধূতিকা পথে ঊর্ধ্বগা করিতে পারিলে অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ মহাসুখ লাভ হয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়বিধ তন্ত্রশাস্ত্রে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, একটি অদ্বয় তত্ত্বই হইল পরমতত্ত্ব। এই পরম অদ্বয় তত্ত্বের দুইটি ধারা—হিন্দুমতে একটি হইল শিব—অপরটি শক্তি। গুণাতীত নিষ্কল শিব হইলেন বিন্দু—তাহাই হইল নিবৃত্তিতত্ত্ব; আর ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি হইলেন নাদ—ইহাই হইল প্রবৃত্তি-তত্ত্ব; এই বিন্দু-নাদ—নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি—ইহাদের মিলনের নিম্নগা-ধারায় হইল সংসারপ্রবাহ,—আর তাহাদেরই মিলনের ঊর্ধ্বগা ধারায় হইল অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠা—সহজানন্দ বা মহাসুখ-প্রাপ্তি। অদ্বয় বোধিচিত্তেরও তাই একটি সাংবৃতিক রূপ রহিয়াছে—আর একটি পরমার্থিক রূপ রহিয়াছে। শূন্ততা এবং করুণাই হইল বৌদ্ধমতে অদ্বয় বোধিচিত্তের দুইটি ধারা—একটি প্রজ্ঞা—অপরটি উপায়,—একটি বিন্দু—অপরটি নাদ; একটি নিবৃত্তি—অপরটি প্রবৃত্তি। এই প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলনের নিম্নধারায় হইল বহিঃসৃষ্টি—জরামরণ দুঃখ দৌর্মনস্তের জীবন-যাত্রা; তাহাদের মিলনের একটি ঊর্ধ্বধারা আছে—এই ঊর্ধ্বধারার পথই হইল অবধূতিকা মার্গ; সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া 'স্রোতে

উজাইয়া' চলিতে পারিলেই হয় অদ্বয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ—সেই প্রতিষ্ঠাতেই হয় যে মহাসুখ লাভ তাহাই হইল সহজানন্দ—তাহাই হইল 'সামরস্য'। নিবৃত্তি-রূপিণী শূন্যতাকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয় একটি রস—প্রবৃত্তি-রূপী করুণাকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মের আর একটি রস;—এই উভয় রসের ধারাই স্বাভাবিকভাবে নিম্নগা। এই উভয় রস যদি মধ্যমার্গে আসিয়া মিশিয়া একেবারে এক হইয়া যায়—তবেই তাহা হয় 'সমরস'; এই 'সমরসে'র বিশুদ্ধি হইল ঊর্ধ্বস্রোতে; অবধূতিকামার্গকে অবলম্বন করিয়া এই সমরসের ধারা যখন সর্বোর্ধ্ব অবস্থিতি লাভ করে তখনই তাহা পরিশুদ্ধ 'সামরস্য' রূপ লাভ করিল। এই পরিশুদ্ধ সামরস্যের পূর্ণতম রূপই হইল সহজানন্দ—তাহাই অদ্বয় বোধিচিত্ত। এই মহাসুখ বা সহজানন্দ বা অদ্বয় বোধিচিত্ত লাভই হইল বৌদ্ধসহজিয়াগণের চরম লক্ষ্য। 'অশরীরী কেহ আছে শরীরে লুকাইয়া, যে তাহাকে জানে সে-ই হয় মুক্ত।'

॥ ৩ ॥

এই ত গেল মোটামুটি ভাবে বৌদ্ধ সহজিয়াদের চরম লক্ষ্যের কথা; এইবারে আসা যাক তাঁহাদের সাধনার কথায়। সাধনার দিক হইতে আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের সাধনা মূলতঃ তান্ত্রিক সাধনা। এই তান্ত্রিক সাধনা বলিতে আমরা কি বুঝি? এ-বিষয়েও অনেক সংশয় এবং তর্ক রহিয়াছে—আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহি না। তন্ত্র-সাধনার বহু বহিরঙ্গ দিক রহিয়াছে; সহজিয়া সাধকগণ সর্বদাই বহিরঙ্গ-বিরোধী ছিলেন; তাই তাঁহারা তন্ত্রের বহিরঙ্গ সাধনা ছাড়িয়া মূল সাধনার উপরেই জোর দিয়াছেন। তন্ত্র-সাধনার মূল কথা হইল দেহ-সাধনা—অর্থাৎ দেহকেই যন্ত্র করিয়া তাহার ভিতর দিয়াই পরম সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনা। তন্ত্রমতে দেহভাণ্ডটিই হইল ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্ররূপ—সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যাহা কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহার সবই নিহিত আছে এই দেহভাণ্ডের মধ্যে। সহজিয়ারা বলেন, আমাদের দেহের ভিতরে অবস্থান করিতেছে যে সহজ-স্বরূপ তাহাই হইল বুদ্ধস্বরূপ। বুদ্ধ ত তাহা হইলে অশরীরী রূপে এই শরীরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন—

অসরির কোই সরিরহি লুকো।
জো তহি জানই সো তহি মুকো॥

'অশরীরী কেহ আছে শরীরে লুকাইয়া, যে তাহাকে জানে সেই হয় মুক্ত।'

ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেক্খই পড়িবেসী পুচ্ছই॥

'ঘরে (দেহ ঘরে) আছে, বাহিরে জিজ্ঞাসা করিতেছে; (ঘরে) পতি দেখিতেছ, কিন্তু প্রতিবেশীকে (তাহার খোঁজ) জিজ্ঞাসা করিতেছ।'

আবার বলা হইয়াছে,—

পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্খাণই।
দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই॥

'পণ্ডিত সকল করেন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান, জানেন না সেই বুদ্ধকে যিনি বাস করেন দেহের মধ্যেই।'

সরহপাদ আরও চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন—

এত্থু সে সুরসরি জমুণা
এত্থু সে গঙ্গাসাঅরু।
এত্থু পআগ বণারসি
এত্থু সে চন্দ দিবাঅরু॥
ক্ষেত্তু পীঠ উপপীঠ এত্থ
মইঁ ভমই পরিট্ঠিও।
দেহা সরিসঅ তিত্থ মইঁ
সুহ অণ্ণ ণ দীট্ঠিও॥

'এখানেই (এই দেহেই) সেই সুরসরিৎ (গঙ্গা) ও যমুনা, এখানেই সেই গঙ্গাসাগর; এখানেই প্রয়াগ বারাণসী, এখানেই হইল চন্দ্র দিবাকর; ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ—সবই হইল এখানে, বহু ঘুরিয়া এই বুঝিয়াছি—দেহ সদৃশ তীর্থ এবং সুখ আর কোথাও দেখা গেল না।'

চর্যাপদগুলির মধ্যে আমরা বহু ভাবে দেখিতে পাই এই দেহকে অবলম্বন করিয়া সাধনার কথা। কোথাও দেখিতে পাই 'দেহ নঅরী'তে বিহারের কথা,—কোথাও দেখিতে পাই 'কায় নৌকা'কে ভব-সমুদ্রের ভিতরে বাহিয়া যাইবার কথা। চর্যাকারগণও বার বার বলিয়াছেন, অতি নিকটেই—এই দেহেই আছে বোধি—বোধিলাভের জন্ম প্রয়োজন নাই লঙ্কার যাইবার; 'নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।' কোথাও বলা হইয়াছে কায়রূপ মায়াজাল বহিবার কথা—'বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল'; 'কোথাও দেহকে বলা

হইয়াছে রথ (জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই ইত্যাদি), কোথাও দেহকে বীণা করিয়া বাজাইবার কথা হইয়াছে (বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা) ; দেহকে নৌকা করিয়া নৌকা বাহিবার রূপকই গ্রহণ করা হইয়াছে সব চেয়ে বেশি।

দেহকে যন্ত্ররূপে অবলম্বন করিয়া সহজানন্দরূপ পরম সত্যকে দেহের মধ্যেই অনুভব করিতে হয়, এই মতকেই সাধনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ —তথা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ দেহের মধ্যে কতকগুলি চক্র বা পদ্মের কল্পনা করিয়াছেন, এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের ত্রিকায়ের সহিত একটি সহজকায়, বা স্বাভাবিককায় বা বজ্রকায়ের যোগ করিয়া এই চারি কায়কে এই চারি চক্রে বা চারি পদ্মে স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুতান্ত্রিক মতে আমরা ষট্‌চক্র বা ষট্‌পদ্মের পরিকল্পনা দেখিতে পাই, বৌদ্ধতন্ত্রে সেখানে পাই চারিচক্র বা পদ্ম। প্রথম চক্র হইল নাভিতে, দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে, তৃতীয় কণ্ঠে, চতুর্থ মস্তকের সর্বোচ্চ দেশে (তুলনীয় হিন্দুমতে সহস্রার)। নাভিতে হইল নির্মাণকায়-তত্ত্বের অবস্থিতি, সুতরাং নাভিতে হইল নির্মাণ-চক্র ; এইরূপ হৃদয়ে ধর্মচক্র, কণ্ঠে সম্ভোগ-চক্র, (মহাজান মতানুসারে অবশ্য হৃদয়ে সম্ভোগ-চক্র এবং কণ্ঠে ধর্মচক্র হওয়া উচিত ছিল, কারণ নির্মাণকায়ের পরে সম্ভোগকায়— তাহার পরে ধর্মকায়) এবং মস্তকস্থিত 'উষ্ণীষ চক্রে' হইল 'সহজ-চক্র' বা 'মহাসুখচক্র' ; বোধিচিত্তের স্থিতি এই উষ্ণীষ কমলে।

আমরা দেখিয়াছি, বোধিচিত্তের দুইটি ধারা, প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা—এবং উপায়রূপ করুণা। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারাই বিন্দু ও নাদ-তত্ত্ব গ্রাহক- ও গ্রাহ্য-তত্ত্ব, নিবৃত্তি- ও প্রবৃত্তি-তত্ত্ব। বাম নাসারন্ধ্র হইতে প্রবাহিত হয় যে বামগা নাড়ী (হিন্দুতন্ত্র-মতে ইড়া) তাহাই হইল প্রজ্ঞারূপিণী, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে প্রবাহিত হয় যে দক্ষিণগা নাড়ী তাহাই হইল উপায়রূপিণী (হিন্দুতন্ত্র মতে পিঙ্গলা) ; আর এই দুই নাড়ীর ঠিক মধ্যভাগ হইতে প্রবাহিত যে নাড়ী (হিন্দুতন্ত্র মতে সুষুম্না) তাহাই হইল আমাদের পূর্বব্যাখ্যাত অবধূতী বা অবধূতিকা—ইহাই হইল অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ লাভের জন্য মধ্য-মার্গ। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, নানাভাবে এই মধ্যপথের কথা বলা হইয়াছে। সহজিয়াদের মধ্যপথের সাধনা হইল এই অবধূতিকা-মার্গকে অবলম্বন করিয়া। এই যে বামগা এবং দক্ষিণগা নাড়ী—ইহারাই হইল শূন্যতা-করুণা, প্রজ্ঞা-উপায়, বিন্দু-নাদ, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি, গ্রাহক-গ্রাহ্য প্রভৃতি সর্বপ্রকারের দ্বৈতত্ত্বের প্রতীক। এই দ্বৈতত্ত্বের প্রতীক নাড়ীদ্বয়কে আরও অনেক নামে

অভিহিত করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে দেহের বামদিকে শূন্যতা-রূপিণী প্রজ্ঞাতত্ত্ব এবং দক্ষিণদিককে করুণারূপ উপায়তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। শূন্যতা বজ্র বলিয়া বামগা নাড়ী বজ্র, দক্ষিণগা নাড়ী সৃষ্ট্যাত্মক উপায়ের প্রতীক বলিয়া পদ্ম বলিয়াও অভিহিত হয়; ইহারা কুলিশ-কমল নামেও খ্যাত। শূন্যতা স্বতন্ত্রা বলিয়া বামগা নাড়ী স্বর (বা 'আলি' অর্থাৎ অকারাদিক্রমে বর্ণমালা) আর করুণা বা উপায় পরতন্ত্র বলিয়া দক্ষিণগা নাড়ী ব্যঞ্জন (বা 'কালি'—অর্থাৎ ক-কারাদি ক্রমে বর্ণমালা)। বামা হইল গঙ্গা নদী, দক্ষিণা যমুনা; বামা চন্দ্র (বা শশী), দক্ষিণা সূর্য (বা রবি); বামা রাত্রি, দক্ষিণা দিবা; এইরূপে আমরা আরও নাম দেখিতে পাই, যেমন—প্রাণ-অপান, ললনা-রসনা, চমন-ধমন, এ-বং ভব-নির্বাণ ইত্যাদি। সাধনার ক্ষেত্রে এই নামগুলি নাড়ী-দ্বয় বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়াছে, আবার সাধারণভাবে সর্বপ্রকারের দ্বৈতত্ত্ব বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানেই বাম-দক্ষিণ ছাড়িয়া মধ্যপথের কথা বলা হইয়াছে সেই-খানেই অবধূতিকা মার্গ ঊর্ধ্বস্রোতে অদ্বয়-বোধিচিত্তের পথ বা মহাসুখ বা সহজানন্দের পথ বুঝিতে হইবে।

সহজিয়াগণের আসল সাধনা হইল সর্বপ্রকারের দ্বৈত-বিবর্জিত হইয়া অদ্বয় মহাসুখে বা সহজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা। তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরমার্থ অনু-ভূতির জন্য তাঁহারা যে সাধনা করিতেন দেহই তাহার অবলম্বন বলিয়া নাড়ী-চক্রাদি অবলম্বিত সাধনার উপরে তাঁহারা জোর দিয়াছেন। প্রথমে বামা ও দক্ষিণা নাড়ীদ্বয়কে নিঃস্বাভাবীকৃত করিতে হইবে। তাহাদের ক্রিয়াধারা স্বাভাবিকভাবে নিম্নগা; এই নিম্নগা ধারাকে যোগের সাহায্যে প্রথমে বিশুদ্ধ করিয়া রুদ্ধ করিতে হইবে—তাহার পরে সমস্ত ধারাকে একীকরণের সাধনা; যখন সব ধারা একীকৃত হইল মধ্যমার্গে—তখন সেই মধ্যমার্গে তাহাকে করিতে হইবে ঊর্ধ্বগা। সেই ঊর্ধ্বগা ধারাই আনন্দের ধারা; সেই আনন্দের মধ্যে অনুভূতির তারতম্য আছে; প্রথমে যে ঊর্ধ্বস্পন্দনাত্মক আনন্দানুভূতি তাহার নাম আনন্দ,—দ্বিতীয়ানুভূতি হইল পরমানন্দ—তৃতীয়ানুভূতি বিরমানন্দ—চতুর্থানুভূতি হইল সহজানন্দ। এই চতুর্থানুভূতি সহজানন্দই হইল চতুর্থশূন্য প্রকৃতিপ্রভাস্বর সর্বশূন্য। বোধিচিত্ত উষ্ণীষ-কমলস্থিত চন্দ্র,—সহজানন্দেই ঘটে সেই চন্দ্র হইতে অমৃতক্ষরণ।

এই সহজানন্দের সাধনা—এই মহাসুখের সাধনা—বা এই অদ্বয় বোধি-চিত্তের সাধনার কথা ছড়াইয়া আছে বহু চর্যাপদের মধ্যে। প্রথম পদেই বলা

হইয়াছে চঞ্চলচিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করিতে হইবে মহাসুখের মধ্যে তাহাকে বিলীন করিয়া। সেই সাধনার অগ্রসর হইয়া—

ভণই লুই আম্হে ঝানে (সাণে) দিঠা।

ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা॥

'লুই বলিতেছে, আমি ধ্যানে (বা সানে, অর্থাৎ আভাসে-ইঙ্গিতে) দেখিলাম,—ধমন-চমন দুইয়ের উপরে বসিয়া আছি।' অর্থ দুইকে এক বলিয়া অদ্বয় মহাসুখে অবস্থিত বা মগ্ন আছি।

পঞ্চম পদে চাটিলপাদ বলিয়াছেন, দুই অন্তেই কাঁদা—মাঝে নাই থই। এই দুইকে তাহা হইলে মিলিত করিতে হইবে। চাটিলপাদ নদীর দুই পারে মিলাইয়া দিবার জন্ত সাঁকো গড়িলেন—সাঁকো গড়া শব্দের অর্থই দুইকে মিলাইয়া দেওয়া; এই দুইকে জুড়িয়া সাঁকো গড়িবার জন্ত মোহতরুকে ফাড়িয়া পাট জোড়া হইয়াছে—অদ্বয়-দৃষ্টিকে করা হইয়াছে টাঙ্গি। এই সাঁকোতে চড়িলেও 'দাহিণ বাম মা হোহী'—গ্রহণ করিতে হইবে অদ্বয় মহাসুখের মধ্যপথ।

কাহ্ণপাদ যেখানে বলিয়াছেন 'অলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা,—তখন এই আলিকালি রূপ দ্বৈতদ্বয়ের দ্বারা পরমার্থের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এই ব্যঞ্জনাই গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য যোগের দিক হইতে ইহার অন্ত ব্যাখ্যাও করা চলে,—সেখানে অর্থ হইল, আলি এবং কালিকে বিশুদ্ধ করিয়া এবং উভয়কে একীকৃত করিয়া অবধূতী পথ রুদ্ধ করিলাম বা দৃঢ় করিলাম—অর্থাৎ সকল নিম্নগা ধারা রুদ্ধ করিয়া দিলাম। অষ্টমপদে কম্বলাম্বরপাদ বলিয়াছেন—

বাম দাহিণ চাপী মিলিমিলি মাঙ্গা।

বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা॥

'বাম-দক্ষিণ চাপিয়া পথ মিলাইয়া মিলাইয়া—(অবধূতিকা) পথেই মিলিল মহাসুখের সঙ্গ।'

কাহ্ণপাদ কোথাও চিত্তকে গজেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—যে মত্ত গজেন্দ্র 'এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ'—এ-কার এবং বং-কার রূপ দুইটি দৃঢ় থাম মর্দিত করিয়া দিয়াছে। আবার কোথাও—

আলি-কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।

রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে॥

আলি-কালির ঘণ্টা-নূপুর তাঁহার চরণে—রবিশশী কুণ্ডলের আভরণ তাঁহার কর্ণে। সব কথারই ব্যঞ্জনা দুইকে নাশ করিয়া অদ্বয় সহজ বা মহাসুখের

সামরস্যে স্থিতি। বীণাপাদ আবার সূর্যকে লাউ করিয়া—চন্দ্রকে তাহার সঙ্গে তার লাগাইয়া—অবধূতীকে মাঝখানের দণ্ড করিয়া দেহকে চমৎকার একটি বীণাযন্ত্রে পরিবর্তিত করিয়া এই বীণা বাজাইয়াই সহজের সাধনা করিতেছেন (১৭ সং)। সরহপাদ বলিয়াছেন—

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মূকুল ॥

'নাদ নাই বিন্দু নাই—না আছে রবি-শশীর মণ্ডল—আছে শুধু স্বভাবে মুক্ত চিত্তরাজ', এই নাদ-বিন্দু, রবি-শশীর অতীত যে স্বভাবমুক্ত চিত্তরাজ—তাহাই হইল সহজ-স্বরূপ। এই পদের শেষেও তিনি বলিয়াছেন,—

বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বপা উজবাট ভাইলা ॥ (৩২ সং)

'বাম-দক্ষিণে খাল-বিখাল, সরহ বলে, বাপু সোজা পথ হইল।' সরহপাদ তাঁহার আর একটি পদে বলিয়াছেন,—

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মন কেড়ুআল।
সদগুরুবঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহু রে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই ॥
নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণেঁ ॥
বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব বি বোলিআ ॥
কূল লই খরে সোন্তেঁ উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাঅ ॥ (৩৮ সং)

'কায় হইল নৌকা, খাঁটি মন হইল দাঁড়; সদ্গুরুর বচনে ধর হাল। চিত্ত স্থির করিয়া নাও ধর—অন্ত উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী নৌকা গুণে টানে, সহজের সঙ্গেই মিলিত হও—আর অন্যত্র যাইও না। পথে ভয় বলবান্ শঠের (চন্দ্র-সূর্যের); (সেই দুই শঠের প্রভাবে) ভব (অস্তিত্ব) উল্লোলে সবই হইল পিচ্ছিল। কূল লইয়া খরস্রোতে উজাইয়া চলে—সরহ বলে গগনে গিয়া প্রবেশ করে।'

এখানে দেখিতে পাইতেছি, কায়-রূপ নৌকা লইয়া বাহিয়া আগাইয়া চলিবার প্রতিবন্ধক হইল পথের বলবান্ শঠেরা—ঐ সেই 'দুই' শঠ। তাহাদের

বশীভূত করিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু সেই আগাইবার পদ্ধতিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়—আগাইতে হইবে খরস্রোতে উজাইয়া। —আর গিয়া পৌছাইতে হইবে কোথায়? পৃথিবী হইতে রওনা হইয়া পৌছাইতে হইবে গিয়া গগনে। নৌকার গতি সাধারণতঃ অনুকূল স্রোতের সঙ্গে নিম্ন দিকে; দেহ-নৌকার গতিও ভব-প্রবাহের অনুকূলে নিম্নমুখে; সেই গতি ফিরাইয়া লইতে হইবে; কায়কে লইয়া চলিতে হইবে উর্ধ্ব গতির সাধনায়—পৌছিতে হইবে পৃথিবী হইতে গগনে—বিষয় হইতে শূন্যে—রূপ হইতে স্বরূপে। ইহাই হইল ভারতীয় যোগিগণের 'উল্টা-সাধন' বা 'উজান-সাধন'। কম্বলাম্বরপাদও পৃথিবীর ঠাঁই রূপের রূপা রাখিয়া দিয়া শূন্যের সোনা লইয়া করুণার নায়ে রওনা হইয়াছেন। কোথায় যাইবেন?—'বাহতু কামলি গঅণ উবেসে' (৮ সং) পৃথিবীর ঠাঁই রূপের রূপা রাখিয়া করুণার নায়ে শূন্যতার সোনা লইয়া তাহাকে যাইতে হইবে গগনের উদ্দেশে—উর্ধ্বগতিতে এই যাত্রা।

রূপকচ্ছলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সহজানন্দের কথা বুঝাইতে গিয়া চর্যাকারগণ সহজানন্দকে বহু স্থলে বিবিধরূপে নারী বলিয়া কল্পনা এবং বর্ণনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাহাকে দেখিতে পাই 'যোগিনী' বলিয়া; যেমন—

> জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
> তো মুহ চুম্বি কমলরস পীবমি। (৪ সং)

কোথাও এই সহজানন্দ-রূপিণী নৈরাত্মা-যোগিনীকে বলা হইয়াছে 'ডোম্বী', কোথাও চণ্ডালী, কোথাও মাতঙ্গী, কোথাও শবরী বলিয়া,—বেশি স্থানেই দেখিতে পাই তাহাকে স্পর্শের অযোগ্য নীচকুলোদ্ভবা বলিয়া। ইহার কারণ হইল এই সহজানন্দরূপিণী যোগিনীটি একেবারেই ইন্দ্রিয়াতীতা; ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা স্পর্শনীয়া নয় বলিয়াই এই যোগিনীটিকে অস্পর্শা নীচজাতীয়া রমণী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'অস্পর্শা ভবতি যস্মাৎ তস্মাৎ ডোম্বী প্রকীর্তিতা'। দশম পদে এই ডোম্বীর একটি বিশদ বর্ণনা পাইতেছি। সমগ্র পদটি পরবর্তী প্রবন্ধে (১১৯ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত আছে। এই পদে দেখিতেছি, এই ইন্দ্রিয়াতীতা সহজানন্দরূপিণী ডোম্বীর বাস হইল নগরের বাহিরে—অর্থাৎ দেহ-নগরের বাহিরে, ইন্দ্রিয়াদির নাগালের বাহিরে; এই জন্য পাণ্ডিত্যাভিমানী যত ব্রাহ্মণ নেড়ার দল তাহারা ইহাকে যেন ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায়—ঠিকভাবে ছুঁইতে পারে না। বাহ্য কাপালিক যাহারা তাহারা এইজাতীয় নীচ-জাতীয়া ডোম্বীর সঙ্গ করে একেবারে নিঘৃণ হইয়া; আর কাহ্নপাদ হইলেন আত্মজ্ঞ

কাপালিক—'কং মহাসুখং পালয়তীতি কাপালিকঃ' মহাসুখকে পালন করেন বলিয়াই তিনি কাপালিক—তিনি ঘৃণার সংস্কার ত্যাগ করিয়া সঙ্গ করিতে চান এই সহজানন্দ ডোম্বীর। নাভিচক্রে (মণিপুরে—অর্থাৎ নির্মাণ-চক্রে) এই সহজানন্দের স্পন্দন প্রথম অনুভূত হয়, এই মণিপুরের পদ্ম হইল চৌষট্টি দলযুক্ত—সেই জন্যই বলা হইয়াছে যে, একটি পদ্ম, চৌষট্টিটি পাপড়ি—তাহাতে চড়িয়া নাচে আদরিণী ডোম্বী। বাহিরের ডোম্বী নৌকায় চড়িয়া আসা-যাওয়া করে—ভিতরের ডোম্বী কাহার নায়ে যে আসা-যাওয়া করে তাহার রহস্য কেহ জানে না। বাহিরের ডোম্বী তাঁত বিক্রয় করে আর করে চাঙাড়ি বিক্রী—ভিতরের ডোম্বী বিক্রয় করে অবিদ্যার তাঁত—বিষয়াসক্তির চাঙাড়ি। বাহিরের ডোম্বী পুকুর ভাঙ্গিয়া খায় মৃণালখণ্ড—তাহার ফলে মার খায় লোকের কাছে। অপরিশুদ্ধ সাংবৃতিক রূপে এই আনন্দানুভূতির ডোম্বী দেহ-সরোবরের সারাংশ আহার করে—যোগী তাই তাহাকে মারিতে চান—প্রাণ লইতে চান—অর্থাৎ যোগ সাধনার দ্বারা অপরিশুদ্ধা আনন্দরূপিণী ডোম্বীকে পরিবর্তিত করিতে চান পরিশুদ্ধা সহজানন্দরূপিণী ডোম্বীতে।

অপর একটি পদে (১৪ সং)[১] দেখিতে পাই, এই সহজানন্দরূপিণী নৈরাত্মা দেবীকে একটি মতঙ্গকন্যা রূপে খেয়ার পাটনী রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। গঙ্গাযমুনার দুই ধারার মাঝখানে এই সামরস্যরূপিণী দেবী নৌকা লইয়া পারাপার করেন; এই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বের দুই ধারার ঢেউ প্রবল—মনে হয় এই দুইয়ের মাঝখানে যে পাটনী মেয়ে পারাপারের সংযোগ ব্যবস্থা করিতেছে সে বুঝি ডুবিয়াই গেল—দ্বৈতাশ্রয়ী বিষয়ানন্দই বুঝি অদ্বৈত সহজানন্দকে ঢাকিয়া ফেলিল; কিন্তু সাধনায় যাহার অচল প্রতিষ্ঠা সে যোগীকে এই মতঙ্গ-কন্যা ঠিক পার করিয়া দেয়। পাঁচ দাঁড়ে চলে এই নৌকা—এই পাঁচ দাঁড় হইল পঞ্চতথাগত-শরণ—এবং পঞ্চসাধন-ক্রমের অবলম্বন। আর আছে পিঠে 'কাছি' (দড়াদড়ি) বাঁধিয়া নৌকা টানিবার কথা; ভিতরের অর্থে দেহের মধ্যে প্রত্যেকটি চক্রে একটি প্রসিদ্ধ 'পীঠ'-এর কল্পনা করা হইয়াছে,—সেই চক্রে বা পীঠে যৌগিক 'বন্ধ' (দেহ-মন স্থির করিবার জন্য ও ঊর্ধ্বধারা লাভ করিবার জন্য এক প্রকারের যৌগিক প্রক্রিয়া) প্রয়োগ করিতে হইবে। নৌকার জল —অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি-মল—সেঁচিতে হইবে গগন-সেঁউতিতে—অর্থাৎ প্রজ্ঞা দ্বারা। সৃষ্টি-সংহারের তত্ত্ব চন্দ্র-সূর্য হইল নৌকার দুই চাকা—মধ্যে আছে

---

(১) মূলপদ ও তাহার বঙ্গানুবাদ পরবর্তী প্রবন্ধে (এই গ্রন্থের ১২১ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

যাঙ্গল অদ্বয়ের প্রতীক। এই পাটনী যেয়ে কড়ি-বুড়ি কিছুই লয় না—অর্থাৎ সহজ পথে দিতে হয় না কোনও কৃচ্ছ্রতার বা পাণ্ডিত্যের বহুমূল্য—স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায় পার হইয়া।

অন্য একটি পদে বলা হইয়াছে, কাহ্নুপাদ তিন ভুবন অবলীলায় বাহিয়া আসিয়াছেন; কায়বাক্‌চিত্তের তিনভুবন অতিক্রান্ত হইলে আসে অদ্বয়প্রতিষ্ঠা—তখনই আসে মহাসুখ-লীলায় মগ্নতা। এই মহাসুখে মগ্ন হইলেই লাভ হয় ইন্দ্রিয়াগোচরা সহজরূপিণী ডোম্বীর সঙ্গ। ডোম্বীর সঙ্গ লাভ করিয়া সিদ্ধাচার্য বলিতেছেন,—

কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী॥
তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটালিউ।
কাজণ কারণ সসহর টালিউ॥
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই॥
কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী॥ (১৮ সং)

চঞ্চলা ডোম্বীর চালাকি কিছুই যায় না বোঝা, কুলীনজনের সে বাইরে—ভিতরে থাকে কাপালিকের। কুলীন কথাটি দুই অর্থে এখানে ব্যবহৃত। যাহারা পাণ্ডিত্যাভিমানী তাহারাও কুলীন,—আর যাহারা 'কু'—অর্থাৎ দেহে লীন—অর্থাৎ দেহ-অবলম্বনে সাধনা করিতে গিয়া দেহকে যাহারা আর অতিক্রম করিতে পারে না—দেহেই প্রকারান্তরে বদ্ধ হইয়া পড়ে তাহারাই হইল 'কু-লীন'। এই দুই প্রকারের কোনও 'কুলীন'ই পায় না সহজরূপিণীর সন্ধান; সন্ধান পায় 'কাপালিক'—অর্থাৎ যে মহাসুখ-রূপ 'ক'-কে, (কং মহাসুখং—টীকা) পালন করিতে (ভিতরে ধারণ করিতে) জানে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই মহাসুখ-রূপিণী ডোম্বীর দুইটি রূপ আছে, সাংবৃতিক এবং পারমার্থিক—অপরি-শুদ্ধা এবং পরিশুদ্ধা; অপরিশুদ্ধারূপে যে দেখা দেয় সর্ববিধ ক্লেশবন্ধনের কারণ বিষয়ানন্দরূপে—তাহাই আবার পরিশুদ্ধারূপে দেখা দেয় মহাসুখ-রূপিণী নৈরাত্মারূপে। তাই বলা হইয়াছে যে, এই অপরিশুদ্ধা সাংবৃতিকী ডোম্বীই সকল বিটালিত (নষ্ট) করে—সে-ই টালিত বা নষ্ট করে উষ্ণীষকমলে চন্দ্ররূপে অবস্থিত অমৃতময় বোধিচিত্তকে। এই মহাসুখের সাধনায় অনেকে করেন সংশয় প্রকাশ—এই জাতীয় মহাসুখে মগ্ন হওয়াই পরমার্থ কি না; কিন্তু

কাহ্নুপাদ বলিতেছেন,—এ-জাতীয় সংশয় হইল 'অবিদ্বজনে'র—যাহারা ভিতরের খবর সব জানে না তাহাদের; কিন্তু 'বিদ্বজন' কখনও এই ডোম্বীকে কণ্ঠ হইতে ত্যাগ করে না। যোগের দিক হইতে কণ্ঠ হইল সম্ভোগ-চক্র—সেইখানে সহজরূপিণীর সহিত সম্ভোগ। সিদ্ধাচার্য তাই বলিতেছেন,—রহস্যময়ী এই 'কামচণ্ডালী'র গতি—মনে হয় তাহা অপেক্ষা আর নাই কেহ অধিক চপলমতি।

পরের পদটিতে (১৯ সং) কাহ্নুপাদ রূপকচ্ছলে এই ডোম্বীকে বিবাহ করিতে চলিয়াছেন; সেই বিবাহের যাত্রার এবং অন্যান্য আয়োজনের—এবং বিবাহান্তিক নব-মিলনের অবিচ্ছিন্নতা ও গাঢ়তার রহিয়াছে ঘনসংবদ্ধ বর্ণনা।[১] অপর একটি পদে শবরপাদ এই 'সহজসুন্দরী'কে ময়ূরপুচ্ছ এবং গুঞ্জামালায় শোভিত উচ্চপর্বতবাসিনী শবরী বালিকারূপে অপূর্ব কবিত্বে বর্ণনা করিয়াছেন।[২] উচ্চ পর্বত এখানে দেহস্থ সর্বোচ্চ চক্র উষ্ণীষ-চক্র; ময়ূর-পুচ্ছ এবং গুঞ্জামালায় তাহাকে বিচিত্র করিয়া তুলিবার কারণ—তাহার সাংবৃতিক-পারমার্থিক উভয়বিধ রূপের মধ্য দিয়া যে বিচিত্র রহস্যময়ীত্ব তাহারই একটা আভাস দেওয়া। এই রহস্যময়ী বালিকার পাগলা স্বামী (সাধক-চিত্ত) কি সব সময় তাহাকে চিনিতে পারে? নিজের দেহ-ঘরের 'ঘরিণী'কেই মানুষ চিনিতে পারে না—ইহাই হইল সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা।

১। পদটি ও তাহার বঙ্গানুবাদ পরের প্রবন্ধে (১২৮ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

২। পদটি ও তাহার বঙ্গানুবাদ পরের প্রবন্ধে (১১৫-১৬ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য

চর্যাগীতিতে বাঙলা ও বাঙালী

॥ ১ ॥

সাহিত্য সর্বদাই সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি—তাহা শুধু আজিকার দিনে নয়, হাজার বৎসর পূর্বের দিনেও। হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের বাঙলায় যে সকল সাহিত্য রচিত হইয়াছে সেই সকল দোহা ও চর্যাপদগুলির ভিতরেও সেই হাজার বৎসরের প্রাচীন বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির পরিচয় নানাভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে, এই সকল দোহাকার এবং গীতিকারগণ ধর্ম-অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করিলেও তাঁহাদের ভিতরে যে সত্যকার সাহিত্য-প্রতিভা ছিল বহু স্থানে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ধর্মমতের ভিতরে আছে চিন্তা ও অনুভূতি—দুই-ই অমূর্ত; এই অমূর্তকে মূর্ত করিয়া তুলিতে না পারিলে সাহিত্য হয় না। তাহা করিতেই চাই রূপক, চাই অন্যান্য অলংকার। জীবন ও তাহার পারিপার্শ্বিকের রূপ ব্যতীত রূপক তাহার রূপ পাইবে কোথায়? অতএব তৎকালীন বাঙালী-জীবন এবং তাহার পারিপার্শ্বিক বাঙলাদেশকে পদে পদে এই দোহাগানগুলির ভিতরে আসিতে হইয়াছে। দর্শনের জটিলতম তত্ত্ব, সাধনার সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিকেও প্রকাশ করিতে হইয়াছে স্থূলজীবনের চিত্রে ও ভাষায়। বাঙলার প্রাচীনতম গানগুলির ভিতরে তৎকালীন দেশ ও সমাজ-জীবনের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার একটি পরিচয় দেওয়াই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

চর্যাপদকে আমরা যখন বাঙলা সাহিত্য বলিয়া আলোচনা করিব তখন ব্রিটিশ সরকার তাঁহার শাসনকার্যের পরিচালনার জন্য ইচ্ছামত শিকল টানিয়া পূর্বে-পশ্চিমে এবং উত্তরে-দক্ষিণে বাঙলাদেশের যে সীমারেখা স্থির করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমি এখানে প্রাচীন বাঙলার ভৌগোলিক সীমানা-নির্ধারণ-রূপ গবেষণার অবতারণা করিতে চাহি না, তবে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে মোটের উপরে বলা যায়, চর্যাপদের ভিতরে প্রতিফলিত হইয়াছে যে বাঙলাদেশ তাহা নিম্নব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পার হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িষ্যার কিয়দংশ, বর্তমান বিহারের কিয়দংশ

এবং কামরূপ বা বর্ত্তমান আসামের কিয়দংশ লইয়া একটি বৃহৎ ভূভাগ। এই সত্যটি বিস্মৃত হইয়া চর্যাপদের আলোচনায় আমরা অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছি। চর্যার ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন এগুলি প্রাচীন ওড়িয়া, কেহ বলিয়াছেন প্রাচীন বিহারী, কেহ বলিয়াছেন প্রাচীন মৈথিলী, কেহ বলেন, এগুলি খাঁটি প্রাচীন বাঙলা। কিন্তু এই সকল বিতর্কের অবসান হয় চর্যার ভাষার একটি পরিচয় দিলে, সে পরিচয় এই, ইহা দশম হইতে দ্বাদশ শতকের 'বৃহত্তর গৌড়ে'র ভাষা।

এই চর্যাপদগুলির ভিতর দিয়া তৎকালীন বাঙলার ধর্ম, সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক জীবন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি, সেই সম্বন্ধেই এখানে একে একে আলোচনা করিব।

চর্যাপদগুলির আলোচনা করিতে হইলে বৌদ্ধ সহজিয়া দোহাগুলিরও একই সঙ্গে আলোচনা করা উচিত, কারণ এই দোহাগুলিও 'বাঙলা-সাহিত্য'। এখানে বাঙলা-সাহিত্য কথাটি আমি 'বাঙলা-ভাষায় লিখিত সাহিত্য' এই সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া 'বাঙলার সাহিত্য,' অর্থাৎ বাঙলাদেশে বাঙালী কবিগণ কর্তৃক একই কবিমানস লইয়া লিখিত সাহিত্য—এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছি। আমরা দেখি, যাঁহারা চর্যাকার ছিলেন খুব সম্ভব তাঁহারা অনেকেই পশ্চিমী অপভ্রংশে এই দোহাগুলি রচনা করিয়াছেন। বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গী একই। এইরূপ দুই ভাষা প্রয়োগের কারণ কি? ভাষাতাত্ত্বিক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তৎকালীন রাজপুত রাজপরিবারগুলির আভিজাত্যের ফলে এই পশ্চিমী অপভ্রংশ একটা সর্বভারতীয় আভিজাত্য লাভ করিয়াছিল, এই কারণেই বাঙালী কবিগণও পশ্চিমী অপভ্রংশে দোহা রচনায় প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে এই পশ্চিমী রাজবংশীর আভিজাত্যই প্রধান কথা বলিয়া মনে হয় না। আমার মনে হয়, এই দোহা রচনার সাহিত্যিক ঢঙটি একটি পশ্চিমী ঢঙ, এবং এই সাহিত্যিক ঢঙটি এবং তৎসঙ্গে তাহার ভাষাটি জনসমাজে প্রসিদ্ধি এবং প্রিয়তা লাভ করিয়াছিল; সেই জন্যই বাঙালী কবিগণও দোহা রচনায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং দোহা রচনা করিতে গিয়া তাহার ভাষাকেও গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ এক-একটি সাহিত্যিক ঢঙ ও ভাষা এক-এক সময়ে যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার বহু নিদর্শন আছে। পালি-সাহিত্যের ভিতরে আমরা যে 'গাথা' পাই তাহার ভাষা সংস্কৃতও নয়, কোনও বিশেষ প্রাকৃতও নয়, আসলে মনে হয় ওটা কোন

স্থানীয় ভাষা নয়, একটা জনপ্রিয় সাহিত্যিক ভাষা। পরবর্তী কালের আমাদের 'ব্রজবুলী' ভাষার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি; উহা মিথিলার ভাষাও নয়, মধ্যবর্তী কোন জনপদের ভাষাও নয়, আসলে উহা একটা জনপ্রিয় সাহিত্যিক ভাষা—একটা বিশেষ জাতীয় সাহিত্যের বাহনরূপেই তাহার উদ্ভব; এই জন্যই ওড়িষ্যায়, মিথিলায়, বাঙলায়, আসামে যেখানেই যিনি এই বিশেষজাতীয় সাহিত্য-রচনায় প্রণোদিত হইয়াছেন তিনিই এই বিশেষ ভাষাটিকেও কমবেশি গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন।

॥ ২ ॥

চর্যাকারগণ বৌদ্ধ সহজিয়া ছিলেন। সত্য-উপলব্ধির জন্য এই বৌদ্ধ সহজিয়াগণের একটি বিশেষ সাধনা ছিল, সেই বিশেষ সাধনার পথকেই তাঁহারা সহজ পথ বলিতেন, অন্য সকল পথই তাঁদের মতে বক্র বা কুটিল। বাঁকা পথ শুধু ভুলায়, সত্যকে লাভ করিতে দেয় না। এইজন্য সহজিয়াগণ তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিতে তৎকালীন প্রচলিত এদেশের অন্য সকল ধর্মকেই নানাভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনার প্রসঙ্গেই আমরা এদেশে প্রচলিত ধর্মমত সকলের একটা আভাস পাই।

চর্যাপদে ও দোহাবলীতে বেদধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যায়। অবশ্য দু-এক স্থানে যে 'বেদাগমে'র উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে বেদ ঠিক বেদ নয়, এখানে তাহা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রামাণ্য শাস্ত্ররাশির প্রতিনিধি। যেমন—

জাহের বাণচিহ্ন রুব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী॥—চর্যা, ২৯

"যাহার (যে সহজ স্বরূপের) বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা যায় না, তাহা কিরূপে আগম-বেদে ব্যাখ্যাত হইবে?"

বাঙলাদেশ কোনদিনই বৈদিকধর্মের দেশ নয়, বেদাচার-শাসিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বাঙলাদেশে আগমন অনেক পরবর্তী কালে। গুপ্তসাম্রাজ্যের সময় হইতে বাঙলাদেশের আর্যীকরণ আরম্ভ হইলেও ঠিক বেদবিধি বাঙলাদেশে কোন দিনই খুব প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তবে দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর অভিজাত বর্ণহিন্দুগণ পশ্চিমদেশ হইতে ক্রিয়াবিত ব্রাহ্মণ আনাইয়া যাগ-যজ্ঞাদি নিষ্পন্ন করাইতেন এবং বেদপাঠ করাইতেন এরূপ প্রমাণ তৎকালীন ঐতিহাসিক তথ্য এবং কিংবদন্তী উভয়ের

ভিতরেই পাওয়া যায়। এইরূপ বৈদিক যজ্ঞের প্রচলন কিছু কিছু যে এদেশে তখন ছিল তাহার আভাস সরহপাদের নিম্নোক্ত দোহাগুলির ভিতরেই পাওয়া যাইবে।

বহ্মণো হি ম জানন্ত হি ভেউ।
এবই পড়িঅউ এ চ্চউবেউ॥
মট্টি [পাণী কুস লই পড়ন্ত।
ঘরহিঁ বইসী] অগ্‌গি হুণন্ত॥
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অক্‌খি উহাবিঅ কডুএঁ ধূমেঁ॥

'ব্রাহ্মণেরা সত্যকার ভেদ জানে না, এই ভাবেই চতুর্বেদ পঠিত হয়। তাহারা মাটি-জল-কুশ লইয়া (মন্ত্র) পড়ে, ঘরে বসিয়া অগ্নিতে আহুতি দেয়; কার্যবিরহিত (ফলহীন) অগ্নি-হোমের ফলে শুধু কটুধূমের দ্বারা চোখ পীড়িত হয়।'

এই প্রসঙ্গে সরহপাদ দণ্ডী সন্ন্যাসিগণেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী ভঅবঁবেসেঁ।
বিণুআ হোইঅই হংসউএসেঁ॥
মিচ্ছেহিঁ জগে বাহিঅ ভুল্লে।
ধম্মাধম্ম ণ জাণিঅ তুল্লে॥

"একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী প্রভৃতি ভগবদ্‌বেশে (সবাই) ঘুরিয়া বেড়ায়—হংসের (পরম-হংসের) উপদেশে জ্ঞানী হয়; মিথ্যাই জগৎ ভ্রমের বশে বাহিত হয়, তাহারা ধর্মাধর্ম তুল্যরূপেই জানে না।"

শাস্ত্রাভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উল্লেখ বহু স্থানে পাওয়া যায়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের পূজায় বিশ্বাসী হিন্দুগণের উল্লেখও পাওয়া যায়; কিন্তু সাধারণ হিন্দুধর্মের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা ব্যতীতও কতগুলি বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাই এখানে লক্ষণীয়।

এই সময়ে বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা। বস্তুতঃই ইহা বাঙলাদেশের হিন্দুবৌদ্ধ যুগ—কোন্ ধর্ম যে প্রবলতর ছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এই যুগে জৈনধর্মেরও বাঙলাদেশে যে প্রসার ছিল সে কথা উপেক্ষণীয় নহে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের বহু পূর্বেই যে পশ্চিম-বঙ্গে এবং উত্তর-বঙ্গে জৈনদের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। কথিত আছে স্বয়ং মহাবীর রাঢ়দেশে ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, রাঢ়ের অসভ্য

লোকেরা তাহার দিকে কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল। হিউয়েন্ সাং উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব-বঙ্গে অনেক নির্গ্রন্থ (জৈন) দেখিয়াছিলেন, পুণ্ড্রবর্ধন এবং সমতটে দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীদের প্রাচুর্য ছিল। সরহপাদের দোহাগুলি পড়িলে মনে হয়, এই যুগেও বাঙলাদেশের ঘাটে পথে অনেক জৈন ক্ষপণক যোগীর দেখা মিলিত। ইহাদের বর্ণনা করিতে সরহপাদ বলিয়াছেন—

দীহণক্খ জই মলিণেঁ বেসেঁ।
ণগ্‌গল হোই উপাড়িঅ কেসেঁ॥
খবণেহি জাণ বিড়ংবিঅ বেসেঁ।
অপ্পণ বাহিঅ মোক্খ উবেসেঁ॥

"দীর্ঘনখ যোগী মলিন বেশে নগ্ন হইয়া কেশ উৎপাটিত করে। ক্ষপণকেরা পথভ্রান্ত বেশে মোক্ষের উদ্দেশে নিজেদের বহিয়া লইয়া চলে।"

দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীদের কতগুলি বিশেষ বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান ছিল। তাহারা নগ্ন থাকিত বলিয়া তাহাদের নাম দিগম্বর। তাহাদের বিশ্বাস তীর্থংকরগণ আহার ব্যতীতই বাঁচিয়া থাকেন; তাহারা হাতে ময়ূরপুচ্ছের ঝাড়ন বা পশুপুচ্ছের চামর বহন করে, দুই হাতে মাথার কেশ উৎপাটন করে। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই সরহপাদ বলিয়াছেন—

জই ণগ্‌গা বিঅ হোই মুত্তি গুণহ সিআলহ।
লোমুপাড়ণে অত্থি সিদ্ধি তা জুবই নিতম্বহ॥
পিচ্ছীগহণে দিঠ্‌ঠ মোক্খ [তা মোরহ চমরহ]।
উঞ্ছেঁ ভোঅণেঁ হোই জাণ তা করিহ তুরঙ্গহ॥

"যদি নগ্ন হইলেই মুক্তি হইত তাহা হইলে কুকুর-শিয়ালেরও মুক্তি হইত; লোমোৎপাটনে যদি সিদ্ধি থাকে ত যুবতীর নিতম্বের সিদ্ধি; পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ দেখা যাইত তবে ময়ূর-চামরেরও মোক্ষ হইত; উচ্ছিষ্টভোজনে জ্ঞান হইলে জ্ঞান হইত হাতী-ঘোড়ার।"

বাঙলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মেরই প্রাধান্য, হীনযানের যে কোনই প্রভাব ছিল না তাহা নহে। আমরা দোহাগুলির ভিতরে থেরবাদী বৌদ্ধগণের উল্লেখ পাই। থেরবাদিগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

চেল্লু ভিক্খু জে থবির-উএসেঁ।
বন্দেহিঅ পব্বজ্জিউ বেসেঁ॥
কোই সুত্তন্তবক্খাণ বইট্‌ঠো।
কোবি চিত্তে করে সোসই দিট্‌ঠো।

"চেল্ল (রুখশিক্ষাপদী) এবং ভিক্ষু (কোটিশিক্ষাপদী) যাহারা—স্থবিরের উপদেশ প্রব্রজ্যার বেশ বন্দনা করে; কেহ সূত্রান্তব্যাখ্যান করিয়া বসিয়া থাকে (দ্রব্যাদি লোভে), কেহ বা দেখিয়া দেখিয়া সর্বধর্ম (গ্রহণ) করে চিত্তে।"

অন্যদিকে একদলে ধাবিত হইতেছে মহাযানের দিকে; সেখানে আছে আগম আর তর্কশাস্ত্র; কেহ ভাবে মণ্ডলচক্র—অন্তে করে চতুর্থতত্ত্বের উপদেশ।

অণ্ণ তহি মহাজাণহি ধাবই।
তহিঁ সুত্তন্ত তক্কসথ হই॥
কোই মণ্ডলচক্ক ভাবই।
অণ্ণ চউত্থতত্ত্ব দীসই॥

এই সকল প্রচলিত বৌদ্ধধর্মেরও বিরুদ্ধে ছিলেন সহজিয়ারা, তাই ধ্যান-ধারণা এবং সমাধির সাধনার পথে অগ্রসর হন নাই তাঁহারা। ধ্যান-সমাধিতে সুখদুঃখের পরানিবৃত্তি নাই, তাই পূর্ববর্তীদের লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত্ত মরিঅই॥—চর্যা, ১

মহাযান বৌদ্ধধর্ম এই সময়ে মন্ত্রযানের ভিতর দিয়া বজ্রযানে রূপান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মন্ত্রতন্ত্র, ধারণী-জপেও তাঁহাদের মন ছিল না, এই সকলের বিরুদ্ধেও বহুস্থানে তাঁহারা বহু ভাবে বিদ্রোহ জানাইয়াছেন।

বহু প্রকারের যোগি-সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাই এই গান ও দোহাগুলিতে। সরহপাদ বলিয়াছেন তাঁহার দোহায়—

অইরিএহিঁ উদ্দূলিঅ চ্ছারেঁ।
সীসসু বাহিঅ এ জড়ভারেঁ॥
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোণহিঁ বইসী ঘণ্টা চালী॥
অক্‌খি নিবেসী আসণ বন্ধী।
কণ্ণেহিঁ খুসখুসাই জণ ধন্ধী॥

"আর্য যোগিগণ ছাই মাখে দেহে, মাথায় বহে জটাভার, ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালে, কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে; চোখ বুজিয়া আসন বান্ধে এবং কান খুসখুস করিয়া জনসাধারণকে ধাঁধে।"

এই যুগে তান্ত্রিক কাপালিকধর্মের বিশেষ প্রসার ছিল মনে হয়। সহজিয়াগণও অনেক সময় কাপালিক যোগী হইতে চাহিয়াছেন। অবশ্য

ইঁহাদের কাপালিক আদর্শ প্রচলিত কাপালিক আদর্শ হইতে অনেকটা পৃথক্ ছিল; ইঁহাদের মতে 'কং মহাসুখং পালয়তীতি কাপালিকঃ', অর্থাৎ মহাসুখকে পালন করে যে সেই কাপালিক। এই আদর্শ লইয়া কাপালিক হইতে গিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন'—

আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ ॥
... ...
তু লো ডোম্বী হাউঁ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥

"আলো ডোম্বি, তোর সহিত আমি করিব সঙ্গ,—এই জন্য নিঘৃণ কাহ্ন হইয়াছে নগ্ন কাপালী, যোগী।...তুই হইতেছিস ডোম্বী, আমি কাপালী, তোর জন্য আমি গ্রহণ করিয়াছি হাড়ের মালা।" সহজিয়া মতে এ কাপালী যোগী ও ডোম্বীর মিলনের তাৎপর্য যাহা তাহা আমি স্থানান্তরে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি; এখানে শুধু লক্ষণীয়, সহজিয়াদের চারিদিকে যে কাপালিক ধর্ম প্রচলিত তাহার রূপটি। অন্য একটি পদেও কাহ্নপাদ নিজের সহজিয়া যোগের বর্ণনা প্রসঙ্গে কাপালী যোগীর চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন—

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।
অনহা ডমরু বাজাই বীরনাদে ॥
কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারেঁ ॥
আলিকালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে।
রাগদেষ মোহ লাইঅ ছার।
পরম মোখ লবএ মুত্তাহার ॥
মারিঅ সাসু ননন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী ॥—(১১ সং)

"নাড়ীশক্তি খাটে দৃঢ় করিয়া ধরা হইল; অনহত ডমরু বীরনাদে বাজে। কাহ্ন কাপালী যোগী আচারে প্রবেশ করিল, এবং দেহনগরী একাকারে বিহার করে। আলি কালি ঘণ্টা ও নূপুর তাহার চরণে, রবিশশীকে কুণ্ডল আভরণ করিল। রাগদেষ মোহের ছাই লইয়া সে পরম মোক্ষরূপ মুক্তাহার লভে। ঘরে শাশুড়ী ননদ শালীকে মারিয়া কাহ্ন কাপালী হইল।" এখানকার সব সাধন-রহস্য

বাদ দিয়া মোটামুটি জানিতে পারি, কাপালী যোগীরা বীরনাদে ডমরু বাজাইতেন, একা একা বিচরণ করিতেন, পায়ে ঘণ্টা-নূপুর এবং কর্ণে কুণ্ডল দিতেন, গায়ে ছাই মাখিতেন, ঘরের আত্মীয়-পরিজন সব ত্যাগ করিয়া যোগী হইতেন। পুরুষেরা যেমন এইরূপ সব ত্যাগ করিয়া কাপালী যোগী হইতেন, নারীরাও সেইরূপ 'স্বামী খাইয়া' যোগিনী সাজিতেন, ইহারও আভাস আছে। যেমন সরহপাদের একটি দোহা—

> ঘরবই খজ্জই সহজেঁ রজ্জই কিজ্জই রাঅ বিরাঅ।
> নিঅপাস বইট্‌ঠী চিত্তে ভট্‌ঠী জোইণি মহু পড়িহাঅ॥ (৮৫ নং)

"গৃহপতিকে খায়, সহজে বিরাজ করে, রাগ-বিরাগ করে; নিজপাশে বসিয়া চিত্তে ভ্রষ্টা যোগিনী আমার নিকট প্রতিভাত হয়।"

দোহা এবং চর্যাপদগুলির ভিতরে আর এক শ্রেণীর যোগীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইঁহারা প্রাচীন রসসিদ্ধ। এই রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ই নাথসিদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাচীন রূপ। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন-মত হইতেই এই রসসিদ্ধ-মতের উৎপত্তি। ইঁহারা মৃত্যুর পরে মুক্তিলাভ বিশ্বাস করিতেন না, জীবন্মুক্তির সাধক ছিলেন। রসায়নের সাহায্যে এই স্থূল দেহকেই সিদ্ধদেহে এবং সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে পরিণত করিয়া ইঁহারা অবিনাশী হইতে চাহিতেন। এই অবিনাশিত্ব লাভই যোগীর মৃত্যুঞ্জয় শিবত্ব লাভ। তাই তাঁহাদের প্রথম সাধন ছিল রসায়নের সাহায্যে কায়সিদ্ধি লাভ করা। রস-সিদ্ধাদের 'রাসায়নিক রসে'র (পারদ) স্থান গ্রহণ করিল নাথ-সিদ্ধাদের সহস্রারস্থ চন্দ্র হইতে ক্ষরিত সোমরস।

রস-রসায়নের সাহায্যে মুক্তিলাভ সম্ভব এইরূপ বিশ্বাসী প্রাচীন যোগি-সম্প্রদায়ের উল্লেখ আমরা পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভিতরেও পাই। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'জন্মৌষধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ,' অর্থাৎ সিদ্ধিসকল জন্ম হেতু, ঔষধি হইতে, মন্ত্র, তপঃ এবং সমাধি হইতে সম্ভব হয়। এই ঔষধি হইতে সিদ্ধি সম্বন্ধে ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে—'ঔষধিভিঃ অসুরভবনেষু রসায়নেত্যেবমাদি'; ইহার ব্যাখ্যায় বাচস্পতিও বলিয়াছেন যে, এই ঔষধি দ্বারা সিদ্ধিলাভ অর্থ রসায়নের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ। এই মতটিই নাথসিদ্ধাদের ভিতর দিয়া দশম হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে একটি বিশেষ শৈব মতবাদে পরিণত হইয়াছিল। বাঙলাদেশেও সেই সিদ্ধসম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রসার এবং প্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। বাঙলাদেশে প্রচলিত এই রসসিদ্ধাদের বিরুদ্ধেও বৌদ্ধ সহজিয়াগণ কঠোর মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই রসায়নবাদী রসসিদ্ধাগণ

জন্মও স্বীকার করিতেন, মৃত্যুও স্বীকার করিতেন, রস-রসায়নের সাহায্যে এই জন্মমৃত্যুর ঊর্ধ্বে উঠিয়া শিবত্ব লাভ করিতে চাহিতেন। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াগণ আদৌ জন্ম এবং মৃত্যু স্বীকার করিতেন না; অস্তিত্ব-নাস্তিত্ববুদ্ধি উভয়ই বিকল্পজাত, সুতরাং যেখানে আসলে জন্মও নাই মৃত্যুও নাই সেখানে রস-রসায়নের দ্বারা কি হইবে? সরহপাদ একটি গানে বলিয়াছেন—

অম্হে ণ জাণহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলে নাহি বিশেসো॥
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কঙ্খা॥

"অচিন্ত্যযোগী আমরা জানি না, জন্ম মরণ ভব কিরূপে হয়। যেরূপ জন্ম, মরণও তেমনি, জীবন্ত ও মৃতের ভিতরে কোন বিশেষ (পার্থক্য) নাই। যাহারা এখানে জন্ম-মরণে বিশঙ্কিত তাহারাই করুক রস-রসায়নের আকাঙ্ক্ষা।"[১]

॥ ৩ ॥

এইবারে আমরা চর্যাপদে বর্ণিত তৎকালীন বাঙলার সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।[২] সমাজ-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই আসে জাতির প্রশ্ন। অবশ্য জাতি কথাটাকে আমরা race এবং caste এই উভয় অর্থেই ব্যবহার করি। বর্তমান প্রসঙ্গে শব্দটিকে আমি ইহার প্রাচীন race অর্থেই গ্রহণ করিতেছি।

বাঙলাদেশ অনার্যপ্রধান দেশ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় হইতে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে বাঙলাদেশে ছিটাফোঁটা করিয়া আর্য জাতি এবং তাহাদের ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আমদানি হইতে থাকে। কিন্তু এই বহিরাগত উপাদান বাঙলাদেশে প্রকারে ও পরিমাণে কখনও এমন প্রধান হইয়া উঠিতে পারে নাই যাহাতে তাহা স্থানীয় সকল উপাদানকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া একেবারে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে। আজ পর্যন্তও বাঙালী জাতি

(১) তুলনীয়—অরে পুত্তা বোজ্ঝু রস-রসণ সুসং চ্ছিন্ন অবেজ্জ ইত্যাদি। সরহপাদের দোহা।

(২) ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে (পৃ. ৩৬-৩৮) এ-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন।

এবং বাঙালীর সভ্যতা-সংস্কৃতি তাহার একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। আর্য জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্পষ্ট বিপুলায়তনের পিছনে বাঙালী জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গাধাবোটের মতন সর্বদা বাঁধিয়া না দিয়া তাহাকে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে যদি একটু স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারি তবে তাহাকে আমরা হয়ত আরও বেশি এবং আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাইব।

আর্য জাতির যে কিছু কিছু লোকের আগমন ঘটিয়াছিল বাঙলাদেশে তৎপূর্বে যে সকল অনার্য জাতির বাস ছিল এই দেশে তাহাদের ভিতরে কোল জাতিই ঐতিহাসিকের চক্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আজকার দিনেও আমাদের জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কোল উপাদান একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। এই আদিম কোলগণের ভিতরে শবর পুলিন্দ ডোম চণ্ডাল প্রভৃতি এই চর্যার যুগে সমাজের একটা বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চর্যাগুলির ভিতরে সেইজন্যই তাহারা এত প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে। চর্যাকারগণ নিজেরা একেবারে নিরক্ষর অসংস্কৃত সমাজের নিম্নস্তরের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয় না—চর্যাগুলির ভিতরে তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহাদের চোখেও বার বার সাধনার সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশে এই শবর পুলিন্দ ডোম চণ্ডালের কথা, তাহাদের বাসস্থান, চরিত্র এবং জীবন-যাত্রার কথা যখন এত প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে এই সকল লোকও তৎকালীন বাঙালী জাতির একটা বড় অংশ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় এই সকল আদিম জাতিগুলি সভ্য নাগরিক জীবন হইতে অনেক দূরে সরিয়া ছিল, এবং পরে ইহারাই যে সমাজের নিম্নস্তরে ভিড় করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণও ইহার ভিতরে পাওয়া যায়।[১]

শবরদের কথা ও তাহাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার কথা এই চর্যাপদগুলিতে নানাভাবে দেখিতে পাই। এই শবর বাস করিত বড় বড় পাহাড়ের উত্তুঙ্গশিখরে।

বরগিরিসিহর উত্তুঙ্গ মুণি সবরেঁ জহি কিঅ বাস।

শবরপাদের একটি গানে এই শবর-শবরীদের পার্বত্য জীবনের অতি চমৎকার একটি বর্ণনা পাইতেছি।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥

---

(১) ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার 'বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ' পুস্তিকায়ও এ-বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

উমত্ত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
ণিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবর ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুখে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক্ পুঞ্ছিআ বিন্ধ ণিঅমণ বাণে।
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ পরম ণিবাণে॥
উমত্ত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥

(২৮ সং)

"উঁচা উঁচা পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা; ময়ূরের পুচ্ছ পরিধানে শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, ওগো পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না, দোহাই তোমার—আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজসুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হইল, গগনে লাগিল ডাল; একেলা শবরী এ-বনে ঘুরিয়া বেড়ায়—কর্ণকুণ্ডলবজ্র ধারণ করিয়া। তিন ধাতুর খাট পাড়িল শবর, মহাসুখে বিছাইল শয্যা; শবর ভুজঙ্গ এবং নৈরাত্মা স্ত্রী—উভয়ে প্রেমের রাত্রি পোহায়। হৃদয় তাম্বুল, মহাসুখে কর্পূর খায়, শূন্য নৈরামণি (নৈরাত্মা) কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহায়। গুরুবাক্য ধনু, নিজ মনরূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ, এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণ বেধ। উন্মত্ত শবর গুরু রোষে, গিরিবরের শিখরসন্ধিতে করিতেছে প্রবেশ, শবর আবার ফিরিবে কি করিয়া?"

এখানে দেখিতেছি জনবসতির দূরে উঁচু পাহাড়ে শবর-শবরীর বাস, ময়ূর-পুচ্ছ এবং গুঞ্জামালায় ছিল শবরীর প্রসাধন, কানে ছিল তাহার কুণ্ডল। ভোলানাথ শবর-শবরীকে যাইত ভুলিয়া (নেশার ঝোঁকে), শবরীকে আবার তাহাকে ডাকিয়া ঘর সামলাইতে হইত। ঘরের খাটিয়ায় পড়িত তাহাদের বিছানা, নিবিড় ছিল মিলন। তাম্বুল কর্পূর মিলনের রস পরিপোষণ করিত। শরধনু দিয়া শিকারেই হইত জীবিকানির্বাহ। ক্রোধপরায়ণ শবর পর্বতকন্দরে চলিয়া যাইত অনেক দূরে, একা খুঁজিত তাহাকে শবরী।

শবরপাদের অপর একটি গানে দেখিতে পাই—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিএঁ কুরাড়ী
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥

... ...

হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড়এ সেরে কপাসু ফুটিলা ॥

... ...

কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেলা।
অণুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ॥
চারিবাসে গড়িলারে দিআ চঞ্চালী
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী ॥ (৫০সং)

"গগনে গগনে লগ্ন বাড়ি, হৃদয় কুঠারে তাহাকে উপাড়িয়া (ফেলিলে) কণ্ঠে নৈরামণি শবরী বালিকা জাগে।···আমার সে গগন-সংলগ্ন বাড়ি আকাশের সমতুল দেখিতেছি, কি সুন্দর তাহাতে কাপাস-ফুল ফুটিয়াছে।...কাগনী পাকিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে মাতিয়া উঠিয়াছে শবর-শবরী। অনুদিন শবর একটুও জাগে না, মহাসুখে ভোর হইয়া আছে। চারিপাশে বাঁশের কঞ্চি দিয়া (বেড়া) গড়িল, তাহাতে তুলিয়া শবর সব দাহ করিল, শকুন শিয়াল সব কাঁদে।"

এখানকার সকল তত্ত্বব্যাখ্যা ছাড়িয়া দেখি, পাহাড়ের উপরে প্রায় আকাশের কাছে ছিল শবর-শবরীর বাড়ি, চারিদিকে তাহার কাপাসের ফুল। কাগনী (ধান্য বিশেষ) ছিল তাহাদের প্রিয়তম খাদ্য, এই কাগনী তাহারা রক্ষা করিত বাঁশের কঞ্চির বেড়া দিয়া। পার্বত্য মাঠে শকুন-শিয়ালের ছিল উৎপাত, তাহারা শস্য নষ্ট করিত—তাহাদের হাত হইতেই রক্ষা করিতে হইত শস্য।

এই প্রসঙ্গে আর একটি জিনিস লক্ষণীয়। চর্যাপদগুলির ভিতরে শুধু দুইটি গান শবরপাদ কর্তৃক রচিত, সেই দুইটি গানই শবর-শবরীর জীবন-যাত্রা লইয়া; শবরপাদ নিজেও কি শবর জাতির লোক ছিলেন ?

এই জনবসতি হইতে দূরে উচ্চভূমিতে বাসের কথা আরও দু-একটি পদে দেখিতে পাই—যেমন, 'টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী' ইত্যাদি।

কোলজাতীয় লোকগণের প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় নিষাদরূপে। এই

নিষাদগণের বৃত্তি ছিল ব্যাধবৃত্তি। ব্যাধের হরিণশিকারের সুন্দর বর্ণনা পাইতেছি কয়েকটি চর্যায়। ভুসুকুপাদের একটি কবিতায় পাই—

কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি॥

"কাহার কাছে মিলিয়া আছ কি ভাবে? চৌদিক বেড়িয়া যে হাক পড়িতেছে। আপন মাংসে হরিণ সকলের বৈরী, ব্যাধেরা যে ক্ষণকালের জন্যও ভুসুকুকে (ভুসুকুরূপ হরিণকে) ছাড়ে না।" এই প্রসঙ্গে চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের যে বর্ণনা পাইতেছি তাহাও চমৎকার।

তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় ণ জাণী॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হিঅহি ন পইসই॥ —৬নং

"(ভয়ে) তৃণ ছোঁয় না হরিণ, না খায় জল; হরিণ জানে না হরিণীর নিলয়। হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন তুমি হরিণ, এ বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া (চলিয়া) যাও। তূর্ণগতিতে ধাবমান হরিণের খুর দেখা যায় না; ভুসুকু বলে, মূঢ়ের হৃদয়ে এ কথা পশে না।"

অন্য একটি পদেও ভুসুকুপাদ বলিয়াছেন—

জই তুম্হে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজণা।
নলিনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা॥
জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল রঅণি(?)।
হণবিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিলি॥
মাআজাল পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণী।
সদ্গুরুবোহেঁ বুঝিরে কাসু কহিনি॥ (২৩ সং)

"যদি তুমি ভুসুকু শিকারে যাইবে, তাহা হইলে পাঁচজনকে মার; নলিনী-বনে প্রবেশ করিতে একমন হও। জীবন্তে হইল প্রভাত, মরণে হইল রজনী (?); মাংস বিনে ভুসুকু পদ্মবনে প্রবেশ করিল (?)। মায়াজাল প্রসারিত করিয়া বাঁধিলি মায়া-হরিণী; সদ্গুরুবোধে বুঝি কাহার কি ভয়।"

নিম্নজাতীয়া ডোম্বীর উল্লেখ পাই কয়েকটি গানে। আজকের দিনের মতন হাজার বৎসর পূর্বেও এই ডোম্বীর বাড়ি ছিল নগরের বাহির-প্রান্তে, তখনও সে ছিল নেড়া বামুনদের নিকট অস্পৃশ্যা।

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাই সো বাহ্ম নাড়িআ ॥

এই ডোম্বী নৌকায় আসা যাওয়া করিত এবং দেশে দেশে বাঁশের তাঁত, চুপড়ি ও চাঙাড়ি বিক্রয় করিত। নলনির্মিত পেটিকা (নড়পেড়া) ছাড়িয়া লোকে বাঁশের এই সব জিনিস গ্রহণ করিত।

হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া ॥

আজ পর্যন্ত বাঙলাদেশে নানাস্থানে এই জাতীয় যাযাবর নিম্নজাতীয় স্ত্রীপুরুষ দেখিতে পাই ; তাহারা নৌকাতেই সর্বত্র গমন করে, নৌকাই তাহাদের ঘরবাড়ি ; কয়েকদিনের জন্য কোন স্থানে ওঠে, রাস্তাঘাটে বসিয়া অতি সুন্দর সুন্দর নানাপ্রকার বাঁশের জিনিস তৈয়ার করে এবং লোকালয়ে তাহা বিক্রয় করে। লোকেরা অনেক সময়ে ঘরের বাক্সপেটিকা রাখিয়া এই সকল সৌখীন জিনিস ব্যবহার করে। এই সকল নিম্নজাতীয়া নারীরা অনেক সময় নৃত্যগীত-পরায়ণা হয় এবং তাহা দ্বারাই লোকের মন ভুলায়। এখানে ডোম্বীর বর্ণনায় দেখিতেছি, একটি পদ্ম, তাহার চৌষট্টি পাপড়ি, তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোম্বী।

এক সো পদ্‌মা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥

এখানে একটি পদ্মের চৌষট্টি পাপড়ির উপরে নৃত্যের বর্ণনার ভিতর দিয়া ডোম্বীর অসাধারণ নৃত্যকুশলতার কথাই প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল নিম্নজাতীয়া যাযাবর নারীগণের এই জাতীয় নৃত্যকুশলতার কথা পরবর্তী কালেও অনেক শোনা গিয়াছে। এই নৃত্যগীতকুশলতার সঙ্গে এই ডোম্বীনারী-গণের চরিত্রেও হয়ত চঞ্চলতা আসিত এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর জনগণেরও তাহারা মনোহারিণী হইয়া উঠিত। অপর দিকে উচ্চনীচ-জাতি-সংস্কারবর্জিত কাপালিকগণেরও বোধহয় ইহারা যোগসঙ্গিনী হইত। এই সত্যেরই আভাস পাওয়া যায় কাহ্নপাদের আর একটি পদে—

"কিরূপ হালো ডোম্বী, তোর চাতুরী!—তোর অন্তে কুলীন জন, মাঝে কাপালী। কেহ কেহ তোকে বিরূপ বলে, কিন্তু বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ হইতে ছাড়ে না। কাহ্ন গায়, তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বীর অধিক ছিনালী নাই।" (১৮ সং)[১]

আমরা বাঙলার নগরে এবং পল্লী-অঞ্চলে এখনও আর-একজাতীয় নিম্ন-শ্রেণীর গায়ক-গায়িকা দেখিতে পাই যাহারা লাউ-বাকলের সহিত বাঁশের ডাঁট লাগাইয়া তাহার সহিত তন্ত্রীযোগে একরূপ বীণাজাতীয় যন্ত্র প্রস্তুত করে এবং তাহারই সাহায্যে নাচগান করিয়া দেশবিদেশে ঘোরে। এই জাতীয় গায়ক-গায়িকার উল্লেখ আমরা চর্যাপদেও পাইতেছি।

সুজলাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ-বীণা।
সুন তান্তিধনি বিলসই রুণা॥

... ...

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই॥ (১৭ সং)

"সূর্য লাউ, শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দণ্ড—সব এক করিল অবধূতী। আলো সখি, বাজে হেরুক-বীণা; শূন্যতার তন্ত্রীধ্বনি করুণ (করুণায়) ব্যাপ্ত হইতেছে।...বজ্রাচার্য নাচে, গায় দেবী—এই ভাবে বুদ্ধ-নাটক বিষম (বিপরীত) হইতেছে।"

এখানে 'বুদ্ধ-নাটক' কথাটি লক্ষণীয়। এইরূপ নৃত্যগানের ভিতর দিয়া এই সব গায়ক-গায়িকা কোন বিশেষ ঘটনাকে নাট্যরূপ দান করিতেন। এই নাচগানের সাহায্যে নাটক-করার ভিতর দিয়াই কি বাঙলা নাটকের উৎপত্তি? সংস্কৃতেও ত 'নৃত্ত' হইতেই নাট এবং 'নাটক' হইয়াছে অনুমান করা হয়।

অপর একটি কবিতায় দেখিতে পাই, ডোম্বীর পার্বত্যগৃহে আগুন লাগিয়াছে, তাহাতে জল সিঞ্চন করা হইতেছে। সে আগুনের খরজ্বালা বা ধূম দেখা যায় না, মেরুশিখরের ভিতর দিয়া সে গগনে প্রবেশ করিতেছে—

ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই সিঞ্চহুঁ পাণী॥

---

(১) মূল পদটি পূর্ব প্রবন্ধে ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

নউ ঘরজালা ধূম ন দীশই।
মেরু শিখর লই গঅণ পইসই॥

এই প্রসঙ্গেই আর একটি কথা বলা হইয়াছে—

ফাটুই হরিহর ব্রাহ্মণ নাড়া।
ফীটই ণবগুণ শাসন পাড়া॥

তত্ত্বব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিয়া বাহ্যিক অর্থ কি ইঙ্গিত করিতেছে? নেড়া ব্রাহ্মণ হরিহরও কি ডোম্বীরই প্রতিবেশী ছিল? তাই ডোম্বীর ঘরে আগুন দিয়া ব্রাহ্মণের ঘর সহ তাহাকেও পোড়াইয়া দিল? না নেড়া ব্রাহ্মণ হরিহর জল সিঞ্চন করিতে আসিয়া পুড়িয়া মরিল? নেড়া ব্রাহ্মণ হরিহরও যেমন পুড়িয়া মরিল, তেমনি আবার ডোম্বীর ঘরবাড়ি সব পুড়িয়া যাওয়াতে আর 'নবগুণে'র বা পৈতার, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কড়া শাসন ডোম্বীর উপরে রহিল না। সাধনতত্ত্বের দিক দিয়া অবশ্য 'হরিহর ব্রাহ্মণ' বা 'হরিহর ব্রাহ্ম,' অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সন্ধ্যাভাষিক অর্থ রহিয়াছে।

অন্যত্র এই ডোম্বীকে দেখিতে পাইতেছি পাটনীরূপে, ভাঙ্গা নৌকায় নদী পারাপার করে—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরেঁ বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী যোইআ লীলে পার করেই॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউরা॥
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণদুখোলেঁ সিঞ্চহু পানী ন পইসই সান্ধি॥

... ...

কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কূলে কূলে বুলই॥ (১৪ সং)

"গঙ্গা-যমুনা মাঝে বহে নাও—তাহাতে মতঙ্গকন্যা ডোম্বী জলে ডুবিয়া ডুবিয়া যোগীকে লীলায় করে পার। বাহ গো ডোম্বী, বাহিয়া চল, পথেই দেরি, সদ্-গুরুপাদপদ্মে যাইব জিনপুর। পাঁচটি দাঁড় পড়িতেছে পথে, পিঠে কাছি বাঁধা; গগনরূপ সেঁউতিতে জল সেঁচ, জল যেন নৌকার সন্ধিতে ঢোকে না। ...কড়িও লয় না, বুড়িও (একপয়সা) লয় না, স্বেচ্ছায় করে পার; যাহারা রথে চড়িল, নৌকা বাওয়া জানে না, তাহারা কূলে কূলেই ঘুরিয়া বেড়ায়।"

বেশ বোঝা যাইতেছে, এই নিম্নশ্রেণীর ডোম্বীরা পাটনীর কাজ করিয়া সাধারণতঃ বেশ কড়ি-বুড়ি কামাই করিত।

আজিকার দিনের 'ঘটি-বাঙালে' প্রভেদ এবং বিরোধ তখন হইতেই ছিল মনে হয়। সরহপাদ একটি গানে বলিয়াছেন—

বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহর বিণাণা॥

'বঙ্গে জায়া নিয়াছ, পরে ভাগিল তোমার বুদ্ধি (বিজ্ঞান)।' অন্যস্থানেও দেখিতে পাই, বঙ্গে তখন পর্যন্ত আর্যেতর জাতিরই প্রাধান্য ছিল, ফলে বঙ্গের সহিত রাঢ়-বরেন্দ্রের (পশ্চিম-বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গের) বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, এবং এ-জাতীয় বিবাহের দ্বারা পতিত হইতে হইত। ভুসুকুপাদ একটি গানে বলিয়াছেন—

বাজনাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদয় বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী॥
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥ (৪৯ সং)

"বজ্রনৌকা পদ্মাখালে বাহিলাম, দয়াহীন বঙ্গালে ক্লেশ লুটিয়া লইল। আজ ভুসুকু বাঙ্গালী হইল, নিজ গৃহিণী চণ্ডালী লইল।"

এখানে দেখিতেছি, পদ্মার খালে নৌকা বাহিয়া পদ্মার ওপারে বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল; বঙ্গ বড় দয়াহীন—তাই নৌকায় যাহা কিছু ছিল ডাকাতে লুটপাট করিয়া লইল। আরও দেখিতেছি ভুসুকু বঙ্গে আসিয়া চণ্ডালী বিবাহ করিয়া একেবারে খাঁটি বাঙাল বনিয়া গিয়াছে।

চর্যাপদগুলির মধ্যে তৎকালীন বাঙলাদেশের বহুশ্রেণীর কর্মজীবীর বর্ণনা পাই, ইহাদের ভিতরে কৈবর্ত (মৎস্যজীবী), তাঁতী, ধুনুরী, ছুতার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। নদীমাতৃক বাঙলাদেশে মৎস্যজীবী কৈবর্তজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ। কাহ্নপাদের একটি পদে এই কৈবর্তধর্মের উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হইয়াছে—

তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ॥
পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুয়াল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল॥ (১৩ সং)

নৌকায় বসিয়া মাঝনদীতে একরকমের জাল ফেলিয়া ছোট বৈঠা বা দাঁড় বাহিয়া জেলেরা ভাসিয়া চলে; কখন কোথায় মাছ পড়িবে ঠিক নাই, ভাসিয়া

চলিতে চলিতে জালে হঠাৎ মাছ পড়ে, জাল তুলিয়া মাছ ধরিতে হয়; ইহাই মাছ ধরিবার 'মায়াজাল'। জলসংকুল মাঝনদীতে তখনও এরূপ মায়াজাল পাতিয়া মাছ ধরা হইত বোঝা যাইতেছে।

শান্তিপাদের একটি পদে (২৬ সং) ধুনুরীর উল্লেখ পাইতেছি। চর্যাকার বলিতেছেন—

"তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ আঁশ করিলাম, আঁশ ধুনিয়া নিরবয়ব শেষ করিলাম।···তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্তে গ্রহণ করিলাম, শূন্তকে লইয়া নিজেকেও উৎপাটিত করিলাম।"[১]

তন্ত্রিপাদ (তান্তিপা) রচিত ২৫ সংখ্যক পদটি পাওয়া যায় নাই; ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় তাহার তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে একটি সংস্কৃত ছায়াও রচনা করিয়াছেন। ইহার ভিতরে দেখিতে পাই, এই পদটিতে বস্ত্র-বয়নের রূপকেই সকল তত্ত্বব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[২] সেখানে দেখি, কালপঙ্ককের তাঁত বস্ত্র বয়ন করিতেছে। ইহার 'আমি'ই হইল তাঁত, আপনার ভিতর হইতেই আসে সব সুতা—সেই সুতায় কাপড় বুনিয়া বুনিয়া গগন ভরিয়া ফেলা হয়।

দু-একটি পদে ছুতারদের অস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। যেখানে বলা হইয়াছে, 'জো তরু ছেব ভেবউ ন জানই'—সেখানেই বোঝা যাইতেছে যে, তরুর ছেদন এবং ভেদনের ভিতরে একটা কৌশল ছিল, সে কৌশল এ-বিষয়ে কৌশলী-দেরই জানা ছিল, সাধারণের ছিল তাহা অজানা। অন্যত্র নৌকাগঠনের প্রসঙ্গেও আমরা এই ছুতারবৃত্তির আভাস পাই।

॥ ৪ ॥

নদীমাতৃক বাঙলাদেশ, নদীমাতৃকতার প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত বাঙলার সভ্যতা-সংস্কৃতিতে। এই নদীমাতৃকতার প্রভাব পাইতেছি এই চর্যাপদগুলির ভিতরেও; পদগুলি সাগর-নদী-খাল-বিখালের বর্ণনায় ভরা। প্রধান প্রধান দার্শনিক তত্ত্বগুলি এবং গুহ্য-সাধনতত্ত্বগুলি বর্ণিত হইয়াছে এই সাগর-নদী-খাল-বিখালের রূপকেই।

ভবনই গহণ গম্ভীরবেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥

---

(১) পদটি ৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
(২) দ্রষ্টব্য Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Caryapadas, পৃ ৪৩

নদীর এই অতিরিক্ত কাদাভরা দুই কূল বাঙলাদেশের নদীর বৈশিষ্ট্যসূচক বটে। মহাসুখলাভরূপ পরমনির্বাণের পথে অগ্রসর হইবার সাধনাকে প্রায়ই নদীর পথে নৌকায় অগ্রসরের রূপকে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরমার্থসাধনার সহিত নদীস্রোতে উজাইবার রূপক অবশ্য ভারতীয় শাস্ত্রে আরও অনেক পাওয়া যায় এবং দেহস্থ প্রধান তিনটি নাড়ীর সহিত ভারতবর্ষের প্রধান তিনটি নদী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর উপমা অতি প্রসিদ্ধ। তথাপি মনে হয়, এই নদী খাল এবং তাহাতে নানাভাবে নৌকা বাহিবার রূপক চর্যাকারগণ অনেক বেশি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহার ভিতরে বাঙলার নদীমাতৃকতার প্রভাব অনস্বীকার্য। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, গঙ্গা, যমুনার মাঝে ডোম্বী কিরূপে পাটনী হইয়া বিনা কড়িতেই লোকজন পারাপার করিতেছে (১৪ সং); মাঝনদীতে নৌকা লইয়া মায়াজাল বাহিবার কথাও পূর্বে দেখিয়াছি (১০ সং)। শান্তিপাদ একটি গানে বলিতেছেন—

কূলেঁ কূল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ একুবাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা॥
মাআ মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভান্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জাঅন্তে॥
বামদাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ॥ (১৫ সং)

এখানে যাত্রীকে কূলে কূলে ঘুরিতে বারণ করা হইতেছে—মাঝখানে রহিয়াছে সোজা পথ (সহজ পথ)। সম্মুখে রহিয়াছে যে সমুদ্র, তাহার যদি না বোঝা যায় অন্ত, না বোঝা যায় থই—সম্মুখে না যদি দেখা যায় আর কোন নাও বা ভেলা, তবে এ পথের অভিজ্ঞ পথিকগণের নিকটে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। শূন্য প্রান্তরে না যদি মেলে কোন পথের দিশা, তবু ভ্রান্তি বাসা উচিত নয় আগাইয়া যাইতে; সোজা পথে গেলেই মিলিবে সকল সিদ্ধি। ডাইনে বাঁয়ের দুই পথ ছাড়িয়া চলিতে হইবে কেলি করিতে করিতে এই সমুদ্র পথে; ঘাট-ঝোপ-ঝাড়, বাধা-বিঘ্ন কিছুই নাই, চোখ বুজিয়া নৌকায় চলা যায় এই পথে।

বাঙলাদেশের খাল-বিখালের উল্লেখ দেখি অনেক প্রসঙ্গে—

বাম দাহিণ জো খাল-বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভইলা॥

পথে যাইতে বাঁকে বাঁকে ডাইনে-বাঁয়ে অনেক রহিয়াছে খাল-বিখাল; সরহ বলিতেছে, এই সব বাঁকা খাল-বিখালের ভিতরে প্রবেশ করিও না, আগাইয়া যাও একদম সোজা পথে।

নদীমাতৃক বাঙলাদেশের প্রধান যান-বাহন ছিল নৌকা। এই কারণেই বোধ হয় যোগতত্ত্বের রহস্য বলিতে গিয়া চর্যাকারগণ নানাভাবে এই নৌকা বাহিবার রূপক গ্রহণ করিয়াছেন। দু-একটি কবিতায় নৌকা বাহিবার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে, এবং তাহার ভিতর দিয়া বাঙলাদেশের মাঝিমাল্লাদের একটি চমৎকার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সরহপাদের একটি কবিতায় দেখি—

"কায় নৌকা, খাঁটি মন হইল তাহার দাঁড়,—সদ্‌গুরুবচনে ধর হাল। চিত্ত স্থির করিয়া ধর নাও, অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী (নেয়ে) নৌকা গুণে টানে; ঠিক সহজেই গিয়া মিলিত হও, অন্য দিকে যাইও না। পথে আছে ভয়, বলবান্ দস্যু ভবতরঙ্গে সবই টলমল। কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজাইয়া যায়,—সরহ বলে, গগনে গিয়া প্রবেশ করে (অর্থাৎ গুণের নৌকা খরস্রোত উজাইয়া বহুদূরে—দিকচক্রবালে যেখানে আকাশ ও সমুদ্র এক হইয়া গিয়াছে সেইখানে অদৃশ্য হইয়া যায়)।" (৩৮ সং)[১]

কম্বলাম্বরপাদের একটি পদেও এই নৌকাযাত্রার বর্ণনা পাইতেছি। মাঝিরা সাধারণতঃ একটা ছুঁচলো খুঁটি বা গোজ নদী বা খালের কূলে কাদা মাটিতে পুঁতিয়া তাহার সহিত কাছি বা দড়ি দিয়া নৌকা বাঁধিয়া রাখে। নৌকায় কোথায়ও রওনা হইতে হইলে প্রথমে এই খুঁটি বা গোজাটি তুলিয়া কাছি ছাড়িয়া দিতে হয়। তারপর মাঝগাঙে আসিয়া চারিদিক চাহিয়া শুনিয়া নৌকার দাঁড় বাঁধিয়া বাহিয়া যাইতে হয়। এখানেও বলা হইয়াছে—

> খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
> বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ॥
> মাঙ্গত চড়্‌হিলে চউদিস চাহঅ।
> কেড়ুআল নাহি কেঁকি বাহবকে পারঅ ॥ (৮ সং)

খুঁটি উপাড়িয়া কাছি মেলিল; হে কামলি,[২] সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাহিয়া চল। পথে চড়িয়া চারিদিকে চায়; দাঁড় না থাকিলে কে বাহিতে পারে?"

---

(১) সমগ্র পদটি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) যাহারা মজুরি খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে তাহাদিগকে এখনও পূর্ববঙ্গে কামলা (< কামুলিয়া < কামলিয়া) বলে।

এই নৌকা বাহিবার প্রসঙ্গে আমরা তৎকালীন বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটা ক্ষীণ আভাস পাই। নৌকাতেই দেশের সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য হইত। সোনারূপার বাণিজ্যও বাঙলাদেশে ছিল এবং নৌকায় করিয়াই ব্যবসা-বাণিজ্য হইত। কম্বলাম্বরের উপরিউক্ত কবিতাটির প্রথমেই দেখিতে পাই,—

সোনা ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥

"সোনায় ভরতি আমার করুণার নৌকা, রূপা থুইবার আর ঠাঁই নাই।"

চারিদিকে নদীনালা খালবিল থাকিবার জন্য নানাবিধ সাঁকোর সহিতও বাঙালী বহুদিন হইতেই পরিচিত। চাটিলপাদ একটি কবিতায় বলিয়াছেন, পারগামী লোক যাহাতে নির্ভয়ে নদীর পারাপার করিতে পারে সেইজন্য তিনি বেশ মজবুত একটি কাঠের সাঁকো প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বড় গাছ ফাড়িয়া সাঁকোর পাট জোড়া দেওয়া হইয়াছে, টাঙ্গি দ্বারা ইহাকে শক্তপোক্ত করা হইয়াছে।

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ ॥ (৫ সং)

॥ ৫ ॥

চর্যাপদগুলির ভিতরে তৎকালীন বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের দু একটি চিত্র পাওয়া যায়। কুক্কুরীপাদের একটি গানে আছে—

আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥ (২ সং)

"অঙ্গন ঘরের কাছেই, শোন হে অবধূতি, কানেট (কর্ণভূষণ) চোরে নিল অর্ধরাত্রে। শ্বশুর ঘুমাইয়া পড়িল, বহুড়ী আছে জাগিয়া, কানেট চোরে নিল কোথায় গিয়া তাহা মাগিবে।"

পদগুলি পড়িলে মনে একটি ছবি ভাসিয়া ওঠে। ঘরের বহুড়ী রাত্রেও কর্ণভূষণ পরিয়া শুইয়াছিল, মাঝরাত্রে ঘুমের ভিতরে চোর আসিয়া তাহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। বুড়া শ্বশুর এখনও ঘুমে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে জাগিয়া আছে

বহুড়ী, অসাবধানে কানের অলংকার চুরি হইয়া গেল, কোথায় আবার পাওয়া যাইবে এই অলংকার? যেমন চোরের ভয়, যেমন বিত্তনাশের মনস্তাপ, তেমন আবার শ্বশুর-শাশুড়ীর ভয়, তাই সারারাত বহুড়ী আছে জাগিয়া।

ইহার ঠিক পরের পংক্তিগুলি—

দিবসই বহুড়ী কাগ ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥

অর্থাৎ, "দিবসে বহুড়ী কাকের ডরে চিৎকার করিয়া ওঠে, রাত্রি হইলে কোথায় চলিয়া যায়?"—প্রভৃতি বহুড়ীর চঞ্চল চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। পদটি আমাদিগকে অসংযতস্বভাবা কুলনারী সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ শ্লোক

দিবা কাককতাদ্‌ভীতা রাত্রৌ তরতি নর্মদাম্।
তত্র সন্তি জলে গ্রাহা মর্মজ্ঞা সৈব সুন্দরী॥১

স্মরণ করাইয়া দিবে। দেখা যাইতেছে, অসতী কুলবধূ সম্বন্ধে এই উক্তিটি সেকালে বাঙলার জনসাধারণের ভিতরে বেশ প্রচলিত ছিল।

এই পদে এবং পূর্বের আরও দু-একটি পদে যে চোর-ডাকাতের উল্লেখ পাইয়াছি তাহার উল্লেখ আরও দু'একটি পদে পাওয়া যায়। বাসগৃহে শক্ত প্রহরীর প্রয়োজন ছিল। তাই কাহ্নপাদের একটি পদে দেখি—

সুণ বাহ তথতা পহারী।
মোহ-ভণ্ডার লই সঅলা অহারী॥—(৩৬ সং)

"শূন্যবাহুতে তথতা প্রহার করিয়া মোহভণ্ডার সকলই লওয়া হইয়াছে ছিনাইয়া।"

ঘরের দুয়ারে দৃঢ়ভাবে তালা লাগাইবারও ব্যবস্থা ছিল। সরহপাদের দোহা "জই পবণ-গমণদুআরে দিঢ় তালা বি দিজ্জই" প্রভৃতির ভিতরে ইহার আভাস পাই।

গৃহিণী নারীর প্রতি পুরুষের অভিভাবকত্ব এবং শাসন তখনও কিঞ্চিৎ কঠোর ছিল বলিয়াই মনে হয়। নিম্নলিখিত দোহাগুলিতে এরূপ অনুমানের যথেষ্ট উপাদান মিলিবে।

---

(১) শ্লোকটির পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়—

দিবা বিভেতি কাকেভ্যো রাত্রৌ সন্তরতে নদীম্।
তত্র নক্রকুলং বাপ্তি তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ॥

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকায় এই শ্লোকের উপাখ্যানটি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে এই পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

অইস উএসে জই ফুড় সিজ্ঝই।

পবণ ঘরিণি তহি নিচ্চল বজ্ঝই॥

"এইরূপ উপদেশে যদি ঠিক সিদ্ধি হয়, তবে পবন-গৃহিণী তথায় নিশ্চল হইয়া বদ্ধ হয়।"

নিঅ ঘরে ঘরিণী জাব ণ মজ্জই।

তাব কি পঞ্চবণ্ণ বিহরিজ্জই॥

"নিজ ঘরে ঘরণী যে পর্যন্ত না মজে তাবৎ কি পঞ্চবর্ণে বিহার করা যায়?"

ঘরের কর্তা এবং গিন্নী একসঙ্গে বসিয়া খাওয়া তখনকার দেশাচারের পক্ষে ছিল একেবারে অবিচার।—

ঘরবই খজ্জই ঘরিণি এহি জহি অবিআর।

কাহ্নপাদের একটি কবিতায় তৎকালীন বিবাহের একটি সুন্দর বর্ণনা পাইতেছি—

ভবনিব্বাণে পড়হ মাদলা।

মন পবণ বেণি করণ্ডকশালা॥

জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।

কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ॥

ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।

জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥ (১৯ সং)

"ভব ও নির্বাণ হইল পটহ-মাদল, মন-পবন দুই করণ্ডকশালা; জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত করিয়া কাহ্ন ডোম্বীকে বিবাহ করিতে চলিল। ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জন্ম খাইলাম, কিন্তু যৌতুকে করিলাম অনুত্তরধাম।"

এখানে বর লইয়া শোভাযাত্রার একটি সুন্দর দৃশ্য পাইতেছি। পটহ-মাদল, করণ্ডকশালা, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য সহ প্রচুর আনন্দকোলাহলের ভিতরে এই শোভাযাত্রা চলিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও এইরূপ একটি বিবাহের বর্ণনা পাওয়া যায়—

যতেক মহাপাত্র চারিভিতে সাজে।

শঙ্খ দুন্দুভি সিঙ্গা চারিপাশে বাজে॥

(১০) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালার সিদ্ধা কাহ্নপার গীত ও দোহা' দ্রষ্টব্য।

সিঙ্গা ডম্বুর বাজে, কাংস্য করতাল।
পাচা মাদল ভেক দোসর কাহাল।
... ...
করড়া করড়ী বাজে কুণ্ডলা কুণ্ডলী।
বেণু বাঁশী সরমণ্ডল বাজে চন্দ্রাবলী॥ —ব. সা. প. সংস্করণ

উপরের চর্যাটি পড়িয়া আরও মনে হয়, সেই দিনেও বাঙলাদেশে বিবাহে বরপক্ষ বেশ যৌতুক পাইত এবং ভাল যৌতুকের লোভে বোধ হয় নীচকুল হইতে কন্যা গ্রহণেও আপত্তি ছিল না। এখানে দেখি, ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জন্ম গেল, অর্থাৎ কুল গেল বটে, কিন্তু ভাল যৌতুক যে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই বর খুশি।

দাবা খেলা তখন বোধ হয় বেশ প্রিয় ছিল। কাহ্নুপাদের একটি চর্যাগানে এই দাবা খেলার বিস্তারিত বর্ণনা পাইতেছি—

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদ্‌গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন নিঅড় জিনউর॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িয়া মারিউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্নু আম্‌হে ভাল দান দেহুঁ॥
চউষট্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেহুঁ॥

"করুণার পিঁড়িতে নয়বল (দাবা) খেলি, সদ্‌গুরুবোধে ভববল জিতিলাম দুই নষ্ট হইল, ঠাকুরকে দিও না; উপকারি-উপদেশে কাহ্নুর নিকটে জিনপুর। প্রথমে ব'ড়ে তুড়িয়া মারিলাম, তারপরে গজবর তুলিয়া পাঁচজনকে কায়েল করিলাম। মন্ত্রীকে দিয়া ঠাকুরকে পরিনিবৃত্ত করিলাম, অবশ করিয়া ভববল জিতিলাম। কাহ্নু বলে, আমি ভাল দান দেই, চৌষট্টি কোঠা গুণিয়া লই।'

দাবার 'কোঠে'র চৌষট্টি ঘর বা কোঠা—একটা কিছুর উপরে 'কোঠ' পাতিয়া খেলিতে হয়। এখানে 'ঠাকুর' হইলেন রাজা। প্রথমে হইল 'ব'ড়ে'র

চাল, সুযোগ বুঝিয়া গজ দিয়া অনেকগুলি ঘায়েল করিতে হয়। 'মন্ত্রী' দিয়া 'রাজা'র গতিবিধি বন্ধ করিতে পারিলেই কিস্তিমাৎ।

বিরুপাপাদের একটি গানে শুঁড়ী বাড়ি এবং মদের ব্যবসায়ের একটি বাস্তব বর্ণনা পাইতেছি—

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥
... ...
দশমী দুআরত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥
চউশঠি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল॥ —(৩ সং)

এখানে দেখিতেছি, এক শুঁড়িনী দুই ঘরে সান্ধে, সে চিকন বাকলের দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে। শুঁড়ীর ঘরের চিহ্ন দেখা গিয়াছে দুয়ারেই, দুয়ারে সেই চিহ্ন দেখিয়া মদের গ্রাহক নিজেই চলিয়া আসিয়াছে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হইয়াছে, গ্রাহক যে ঘরের ভিতরে একবার ঢুকিল আর তাহার কোন সাড়াশব্দ নাই। সরু নালে একটা ঘড়ায় মদ ঢালা হইতেছে—বিরুপা সাবধান করিতেছে, বারুণী সরু নল দিয়া ঘড়ায় স্থির করিয়া ঢালিতে।

থোকাথোকা বাঁকা তেঁতুল ফল এখন সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হইয়াছে; কিন্তু এই বাঁকা তেঁতুলের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে স্থান ছিল। চর্যায় দেখি, 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই,'—'গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়।' আমরা ছেলেবেলায় মাঘ-মণ্ডলের ব্রতে গান শুনিয়াছি,

আম ফলে থোকা থোকা তিতৈল ফলে বাঁকা।
ছাওয়াল পুর্থাই বিয়া করে মায়ের ঝোলায় টাকা॥

সাঁওতালীদের গানে উল্লেখ আছে এই তেঁতুল গাছের। একটি গানে আছে,—"আমার ভাবের লোকের সাজ ছিল সোনার, তার আভরণ ছিল রূপার, সে-সব সাজগোজ কী করে ভুলব। আমাদের উঠানে ঐ প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, তেঁতুল গাছের উপর তোলা রইল সে সব, উঠান ঝাঁটা দিতে ভুল হয়ে যাচ্ছে সব।"[১]

---

(১) সাঁওতালী গান, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

॥ ৬ ॥

পূর্বে বাঙলার পার্বত্য নদীর নিকটবর্তী বনভূমিতে অনেক হাতী বিচরণ করিত। সরহপাদের একটি দোহায় আছে,—

মুক্কউ চিত্তগএন্দ কর এথ বিঅপ্প ণ পুচ্ছ।
গঅণগিরী ণইজল পিঅউ তহিঁ তড় বসউ সইচ্ছ॥

"চিত্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত কর, এ বিষয়ে আর কোন বিকল্প জিজ্ঞাসা করিও না। গগন-গিরির নদীজল সে পান করুক, তাহার তটে সে বাস করুক স্ব-ইচ্ছায়।"

কাহ্নপাদের একটি কবিতায় দেখিতে পাই, বন্যহাতী বন্ধ করিয়া সুদৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। কিন্তু মদমত্ত হাতী সব খাম্ভা ভাঙিয়া, দড়ি-দড়া ছিঁড়িয়া গিয়া নিকটবর্তী নলিনীবনে প্রবেশ করিত। (৯ সং)

মহীধরপাদের গানেও এই মত্ত গজেন্দ্রের বর্ণনা পাইতেছি,—

মাতেল চীঅ-গএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই॥
পাপ পুন্ন বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণ টাকলি লাগিয়ে চিত্ত পইঠ ণিবাণা॥

"ধাইতেছে আমার মত্ত চিত্ত-গজেন্দ্র,—নিরন্তর গগনে সকল কিছু ঘোলাইয়া লইতেছে। পাপ-পুণ্য দুই শিকল ছিঁড়িয়া এবং সব খাম্ভা মোড়াইয়া দিয়া গগনশিখরে গিয়া পৌঁছিয়া সে শান্ত হইতেছে (নির্বাণে প্রবিষ্ট হইতেছে)।"

বীণাপাদের একটি গানে হাতী ধরিবার সন্ধি বলা হইয়াছে—সারিগানের সুরে হাতীর মনকে আগে বশ করিতে হয়।—

আলিকালি বেণি সারি সুণিআ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ॥ ইত্যাদি —১৭ সং

আগেকার দিনে মূষিকের অত্যাচারও কম ছিল না। অন্ধকার রাত্রে তাহার আনাগোনা আরম্ভ হইত। সে সব জিনিস তচ্‌নচ্‌ করিত, গর্ত খুঁড়িত এবং উপরে (মাচায় বা গোলায় ?) উঠিয়া আমন ধান খাইত।

ভব বিন্দারঅ মূসা খণঅ গতি।
চঞ্চল মূসা কলিআঁ নাশক থাতী॥
কাল মূসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি চরঅ (হরঅ ?) অমণ ধাণ॥—(২১ সং)

চর্যাপদের সন্ধ্যা বা সন্ধা ভাষা

আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক সাধক-সম্প্রদায়ই ছিলেন কোনও বিশেষ গুহ্য-সাধনার সাধক, এই গুহ্য-সাধনার পদ্ধতি ও অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহারও একটা প্রহেলিকাময় বৈশিষ্ট্য ছিল। অশ্রদ্ধাশীল সাধারণ লোকগণ যাহাতে সাধকগণের সাধনার গূঢ়তত্ত্ব অবগত না হইতে পারে এই জন্যই এইজাতীয় প্রহেলিকাময় ভাষার ব্যবহার, পরে অবশ্য ইহা মধ্যযুগে একটা সাহিত্যিক রীতিরূপেই দেখা দিয়াছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের এই প্রহেলিকা ভাষা সাধারণতঃ সন্ধ্যাভাষা বলিয়া খ্যাত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই সন্ধ্যাভাষাকে বলিয়াছেন আলো-আঁধারি ভাষা,—কিছু বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটি প্রবন্ধে যথেষ্ট তথ্য ও যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, ভাষাটি মূলে সন্ধ্যাভাষা নয়, ইহা হইল 'সন্ধাভাষা' (সম্ + ধা)—অর্থাৎ একটি বিশেষ অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় লইয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে যে ভাষা। বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে অনেক সময় 'আভিপ্রায়িক' ভাষাও বলা হইয়াছে। এখানে যে কথাটি বলা হয় তাহার বাহিরের একটা সাধারণ অর্থ আছে—আবার ভিতরে একটি গূঢ় অর্থের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে এবং সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে এই সন্ধাভাষা শব্দটির এই অর্থে বহু প্রাচীন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মনে করিয়াছেন, অশিক্ষিত লিপিকরগণের প্রমাদবশতঃই সন্ধাভাষা পরবর্তী কালে সন্ধ্যাভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু এ-বিষয়ে একটি তথ্য লক্ষ্য করিতে হইবে, বৌদ্ধতন্ত্রের এবং তাহাদের উপরে টীকা-টিপ্পনীর যে সব প্রাচীন পুঁথি দেখিয়াছি, তাহার সর্বত্রই সন্ধাভাষা শব্দটিকে সন্ধ্যাভাষা রূপেই পাইয়াছি। আমার মনে হয়, সন্ধাভাষা কথাটিই পরবর্তী কালে আভিপ্রায়িক অর্থ হইতে অস্পষ্ট আলো-আঁধারি ভাষার একটা অর্থই গ্রহণ করিয়াছিল এবং এইভাবেই সন্ধাভাষা সন্ধ্যাভাষাতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।

আসল অর্থকে আরও মহিমান্বিত এবং যত্নগ্রাহ্য করিয়া তুলিবার জন্য এই যে প্রহেলিকা ভাষার ব্যবহার ঋক্-বেদ এবং অথর্ব-বেদের বহু স্থানে ইহার নমুনা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যেও আমরা কতগুলি উক্তি বা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাই যাহার অভিধানের পিছনে পূর্বমীমাংসকেরা একটি তাৎপর্যার্থ আবিষ্কার করেন। কিন্তু ঠিক সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার আমরা বহুল-ভাবে দেখিতে পাই তান্ত্রিক শাস্ত্রের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে। তন্ত্রের সাধনা অনেকাংশে গূঢ় এবং গুহ্য; এই সাধনা সাধারণ লোকের হাতে পড়িয়া কোনও বিকৃতি লাভ না করে এই জন্যই এই পারিভাষিক সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার। তন্ত্রের সন্ধ্যাভাষার প্রকৃতি হইল, সেখানে কতগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দের উপরে বিশেষ বিশেষ অর্থ আরোপিত রহিয়াছে,—এই আরোপিত অর্থের সঙ্কেত দীক্ষিত সাধকগণ ব্যতীত অন্যের জানা থাকে না, তাই বাহিরের লোক সহসা ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। হঠযোগের গ্রন্থগুলির মধ্যেও এই জাতীয় পরিভাষা ব্যবহারের রীতি রহিয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ হেবজ্র-তন্ত্রে এবং শ্রীগুহ্যসমাজ-তন্ত্রে একটি একটি অধ্যায়ে এই বিশেষার্থে ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চর্যাগীতিগুলির মধ্যেও এইজাতীয় পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার ছাড়াও চর্যার সন্ধ্যাভাষার বৈশিষ্ট্য হইল, এখানে মাঝে মাঝে এমন বর্ণনা দেখিতে পাই যাহার আক্ষরিক ভাবে এক অর্থ, যোগ সাধনার দিক হইতে সম্পূর্ণ আর এক অর্থ। যেমন—

মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিঅ কাহ্ন ভইঅ কবালী॥

ইহার আক্ষরিক অর্থ হইল,—'ঘরে শাশুড়ী ননদ শালীকে মারিয়া ও মাকে মারিয়া কাহ্ন কাপালী হইল।' কিন্তু যোগের দিক হইতে এখানে 'শাসু' অর্থ হইল 'শ্বাস', 'ননন্দ' অর্থ বিষয়ানন্দদানকারী ইন্দ্রিয়াদি, 'শালী' অর্থ নিঃশেষ, 'মাঅ' অর্থ মায়া, আর 'মারিঅ' শব্দের অর্থ নিঃস্বভাবীকৃত করিয়া। একটি চর্যাপদে আছে—

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই॥
আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥

দিবসই বহুড়ী কাগডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥
অইসন চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।
কোড়ি মাঝে একু হিঅহিঁ সমাইড়॥ (২ সং)

পদটির আক্ষরিক অনুবাদ এই,—'দুলিকে (কচ্ছপকে) দুহিয়া পীঠ ধরণ যায় না; গাছের তেঁতুল কুম্ভীরে খায়। অঙ্গন ঘরের সমীপে, শোন হে বিজাতি (পরিত্যক্তাবধূতিকা) কর্ণভূষণ চোরে নিল অর্ধরাত্রে। শ্বশুর নিদ্রা গেল, বধূটি জাগে; কর্ণভূষণ চোরে নিল, কোথায় গিয়া মাগিবে? দিবসেই বধূ কাকডরে ভয় পায়, রাত্রি হইলে কোথায় যায়? কুক্কুরীপা এইরূপ চর্যা গাহিল; কোটির মধ্যে একজনের হৃদয়ে ইহা প্রবেশ করিল।'

এখানে 'দুলি' অর্থ দুই—সর্বপ্রকার দ্বৈতত্ব বা তাহার প্রতীক দেহের দুই পাশের প্রসিদ্ধ দুইটি নাড়ী। যাহা দোহা হইতেছে তাহা 'সংবৃত্তি বোধিচিত্ত'; 'পীঠ' হইল নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র। বৃক্ষ (রুখ) হইল দেহবৃক্ষ, 'তেন্তলি' হইল বক্রগামী 'বোধিচিত্ত', আর কুম্ভীর হইল যৌগিক 'কুম্ভক'। 'বহুড়ী' হইল অবধূতিকা; ঘর হইল সহজানন্দের স্থান মহাসুখচক্র—আর অঙ্গন হইল বিরমানন্দ-স্থান। 'কানেট' হইল 'প্রকৃতি-দোষ', সহজানন্দই চোর—এবং অর্ধরাত্রি হইল সহজানন্দে সম্পূর্ণ বিলীন হইবার পূর্বক্ষণ। 'শ্বশুর' হইল 'শ্বাস'; 'দিবস' হইল চিত্তের ব্যুত্থানাবস্থা—'রাত্রি' হইল নিলয়ের অবস্থা; 'কামরু' সম্ভবতঃ কামরূপ—সহজিয়াগণের শ্রেষ্ঠ তীর্থ উষ্ণীষকমল।

চর্যাপদে এই যে ধাঁধার ভিতর দিয়া কথা বলিবার ভঙ্গি পরবর্তী কালে এই ধারাটি অবাধিতভাবেই প্রবাহিত হইয়াছে। চর্যায় আমরা একটি পদ পাই,—

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড্‌হিল জাঅ।
(বেঙ্গস সাপ বড্‌চিল জাঅ)
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥
জো সো বুধী শোধ নিবুধী।
জো সো চোর সোই সাধী॥

নিতি নিতি ষিআলা ষিহে সম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ॥

পাদটির বাচ্যার্থ হইল,—'টিলাতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই; হাঁড়িতে ভাত নাই, (কিন্তু) নিত্য আসে। ব্যেঙের সংসার বাড়িয়া যায় (অথবা ব্যেঙ দ্বারা সাপ তাড়িত হয়), দোহা দুধ কি বাঁটে ঢোকে? বলদ বিয়াইল, গাভী বাঁঝা, এ তিন সন্ধ্যা পীঠ দোহন করা হয়। যে বুদ্ধিমান্ সে ত্তত্ব নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু। নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে,—ঢেণ্ঢণ পাদের এই গান বিরলে বোঝ।'

যোগসাধনার দিক হইতে এখানে 'টিলা' হইল মহাসুখ-চক্র, প্রতিবেশী হইল চন্দ্রসূর্য রূপ দ্বৈতাভাস (বা পার্শ্বস্থ দুই নাড়ী); 'হাঁড়ি' হইল দেহভাণ্ড, 'ভাত' হইল 'সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত'—'ব্যাঙ' হইল অবধূতি (বিগতাঙ্গ) প্রভাস্বর বিজ্ঞান। 'দুহিল দুধ' হইল বোধিচিত্ত—'বাঁট' হইল মহাসুখচক্র-পথ। 'বলদ' হইল প্রকৃতি-দোষাশ্রিত অবিদ্যাচিত্ত, 'গাভী' হইল নৈরাত্মা; 'পীঠ' হইল আভাসদোষ বা প্রকৃতিদোষ, দোহন শব্দের তাৎপর্য নিঃস্বভাবীকরণ। 'বুধী' অর্থ মনেন্দ্রিয়প্রধান বালযোগী, চোর অর্থ হইল প্রকৃতিদোষ হরণকারী। 'শৃগাল' হইল অপরিশুদ্ধ চিত্ত—আর সিংহ হইল প্রভাস্বরবিশুদ্ধ চিত্ত। ঢেণ্ঢণপাদের এই পদটির সহিত আমরা কবীরের নিম্নলিখিত পদের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করিতে পারি।—

কৈসেঁ নগরি করোঁ কুটবারী।
চঞ্চল পুরিষ বিচষণ নারী॥
বৈল বিয়াই গাই ভঈ বাঁঝ।
বছরা দুহৈ তীনূঁ সাঁঝ॥
মকড়ী ধরি মাখী ছছি হারী।
মাস পসারী চীহ্ন রখবারী॥
মূসা খেবট নাব বিলইয়া।
মীড়ক সোবৈ পহরইয়া॥
নিত উঠি স্যাল স্যংঘসূঁ জুঝৈ।
কহৈ কবীর কোঈ বিরলা বুঝৈ॥

"কি করিয়া সেই নগর রক্ষা করি যেখানে চঞ্চল হইল পুরুষ—আর বিচক্ষণ হইল নারী। বলদ বিয়াইয়াছে, গাভী হইল বন্ধ্যা, বাছুরকে দোহান হয় তিন সন্ধ্যা। মাকড়সা মাছিকে ধরিল—সে (ছাড়াইতে) চেষ্টা করিল এবং হারিল।

মাংসের প্রহরী চিল রাখা হইয়াছে। মূষিক হইল নাবিক, বিড়াল নৌকা, সাপের পাহারায় ব্যাঙ শোয়। নিত্য উঠিয়া শিয়াল সিংহের সঙ্গে করে যুদ্ধ,—কবীর কহে, কেহ কেহ বিরলে বোঝে।'

কবীরের এই জাতীয় কবিতাকে সাধারণতঃ 'উল্টাওর্ঁাসী, (উল্টার্ঁাসী) বলা হয়। যেখানে মায়া জীবকে বা পুরুষকে পরাভূত করিতেছে সেখানকার অসঙ্গতি প্রকাশ করিবার জন্যই কবীর সাধারণতঃ এই-জাতীয় উল্টাওর্ঁাসীর প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। নীচে কবীরের এই জাতীয় আর একটি উল্টাওর্ঁাসী উদ্ধৃত করিতেছি।—

এক অচংভৌ সুনহু তুম ভাঈ।
দেখত সিংহ চরাবত গাঈ॥
জলকী মছুলী তরবর ব্যাঈ।
দেখত কুতরা লৈ গই বিলাঈ॥
তলেরে বৈসা উপর সুলা।
তিসকৈ পেড় লগে ফলফুলা॥
ঘোরৈ চঢ়ি ভৈস চরাবন জাঈ।
বাহর বৈল গোনি ঘর আঈ॥
কহত কবীর জো ইস পদ বূঝৈ॥
রাম রমত তিসু সব কিছু সূঝৈ॥

'এক আশ্চর্য শোন তুমি ভাই, একটা গাইকে দেখিলাম সিংহকে চরাইতে। জলের মাছ গাছে উঠিল, একটা কুত্তা তাকাইয়া আছে সেই ভাবেই একটা বিড়াল সেগুলিকে (মাছগুলিকে) লইয়া গেল। গাছের নীচেও আপদ—উপরে শূল,—সেই গাছেই দেখা দিতেছে কত ফলফুল; ঘোড়ায় চড়িয়া মহিষ চরাইতে চায়,—বাহিরে রহিল বলদ—বোরাগুলি ঘরে ফিরিল। কবীর কহে, যে এই পদ বুঝে তাহার ভিতরে রমণ করেন রাম—সব কিছুই বুঝিতে পারে সে।'

কবীরের রচনার মধ্যে এ-জাতীয় রচনা বহু; সুতরাং আর উদ্ধৃত করিয়া লাভ নাই। সুন্দর-দাসের রচনার মধ্যেও ঠিক এই জাতীয় রচনা বহু মেলে। সুন্দর-গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'অথ পূরবী ভাষা বরবৈ,' 'অথ বিপর্যয় শব্দ কৌ অঙ্গ,' 'অথ বিপর্যয় কৌ অঙ্গ' প্রভৃতি এই জাতীয় রচনায় ভরা।

বাঙলা এবং হিন্দী নাথসাহিত্যের মধ্যে এই উল্টাধারার গানের খুব প্রাচুর্য। গুরু মীননাথকে সচেতন করিবার জন্য গোরখনাথ যে সকল গান করিয়াছেন

তাহা সবই ধাঁধার; তাহা হইতে 'গোরখধাঁধা' কথাটির অদ্যাবধি এত প্রসিদ্ধি। বাঙলা 'গোরক্ষ-বিজয়ে' দেখি, মীননাথকে লক্ষ্য করিয়া গোরখনাথ বলিতেছেন,—

পখরীতে পানী নাই পাড় কেন ডুবে।
বাসা ঘরে ডিম নাই ছাও কেন উড়ে॥
নগরে মনুষ্য নাহি ঘরে ঘরে চাল।
আক্ষলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল॥

'গোপীচন্দ্রের গানে' দেখিতে পাই বুড়া শিব 'উল্টামন্ত্রে' নৌকাপূজা করিতেছেন। 'গোরক্ষ-বিজয়ে'র ভূমিকাতেও সম্পাদক একটি কৌতূহলোদ্দীপক গান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

গুরু মীননাথরে উল্টা উল্টা ধারা
পুকুর মুরে ধান শুকাইয়া উগারতলে বাড়া॥
... ...
গুরু হে একটি কথা শুনিয়া আইলাম ত্রিপিনীর ঘাটে।
মরা মানুষে ভাত রান্ধে জীতা মানুষের পেটে॥ ইত্যাদি।

সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলেও গোরখনাথের গুরু মীননাথের উদ্দেশে এইরূপ একটি উল্টাধারার গান দেখিতে পাই।—

গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পুতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল, পর্বত ভাসিয়া যায়।
গুরু হে বুঝহ আপন গুণে।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল পল্লব মুঞ্জরিল,
পাষাণ বিঁধিল ঘুণে॥ ইত্যাদি।

এই-জাতীয় গান পূর্ববঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে এখনও খুব শুনিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও অঞ্চলে এই জাতীয় যোগাশ্রিত উল্টাধারার গান 'উল্টা-বাউলের গান' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই-জাতীয় গান আজকাল যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে সব পদেই যে খুব কোনও একটা যোগসাধনার গূঢ়ার্থ নিহিত আছে, এ-কথা বলা যায় না; তবে লক্ষ্য করিলে মাঝে মাঝে সাধনার ইঙ্গিত লাভ করা যায়।

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ এবং বাউলগণও এই উল্টাধারার গান রচনা করিতেন। চণ্ডীদাসের নামে যে সকল সহজ-সাধনার পদ আছে তাহা অনেকই গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক। 'সহজে'র অতীন্দ্রিয় স্বরূপকে যেমন ধাঁধার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা

হইয়াছে তেমনই 'সহজ-সাধনা'র কাঠিন্যকেও নানা উল্টাদৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝান হইয়াছে। যেমন,—

মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পীরিতি বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ॥

আবার,—

প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান
পুলক উপরে ধারা।
ধারার উপরে ধারার বসতি
এ সুখ বুঝয়ে কারা॥
ফুলের উপরে ফুলের বসতি
তাহার উপরে গন্ধ।
গন্ধ উপরে এ তিন আখর
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ॥

প্রেম-সাধনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে ত রসিকরাজ॥
যে জন চতুর সুমেরু-শিখর
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে॥

এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ রাখিতে পারি, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির নাে বহুসংখ্যক প্রহেলিকা পদ রহিয়াছে,—তাহা অবশ্য কোনও তত্ত্ব-সাধ সম্বন্ধীয় নয়।